আজাদুর রহমান চন্দন পেশায় সাংবাদিক। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এটি তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। চন্দনের জন্ম নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার হাওর বেষ্টিত চানপুর গ্রামে। ১৯৮১ সালে এসএসসি পাস করেন। এইচএসসি পাস করার পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি এজি (অনার্স) পাস করেই যুক্ত হন সার্বক্ষণিক সাংবাদিকতায়। ছাত্রাবস্থায়ও কয়েক মাস কাজ করেন তখনকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক একতায়। ছাত্রজীবনেই প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন চন্দন। সে সময়েই মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজেও যুক্ত হন। পরে জাতীয় দৈনিক সংবাদ-এ বার্তা বিভাগে কাজ করার সময় আরো ঝোঁকে পড়েন গবেষণাধর্মী কাজের প্রতি।

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১ ● আজাদুর রহমান চন্দন

আজাদুর রহমান চন্দন

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১

জামায়াতের ভূমিকার গোপন প্রতিবেদন ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টসহ নানা দলিল

আজাদুর রহমান চন্দন

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১

স্বরাজ প্রকাশনী

যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১

আজাদুর রহমান চন্দন

প্রকাশক : স্বরাজ প্রকাশনী
৯৮, আজিজ সুপার মার্কেট, বেজমেন্ট
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন : ০১৫৫২৩০১৭৯২
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০১১

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : কামাল পাশা চৌধুরী
অক্ষরবিন্যাস : লেখক
মুদ্রণ : ফেরদৌস চৌধুরী
ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশনস
১০৪৬, শেওড়াপাড়া, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ০১৭১৩১৪৫৫৮৯
ই-মেইল : swaraj.prokashoni@gmail.com
দাম : ২২০ টাকা

WAR CRIMES & GENOCIDE 1971
by Azadur Rahman Chandan
Published by : Swaraj Prokashoni
98, Basement, Aziz Super Market, Shahbag, Dhaka -1000
Price : Tk 220.00, US $: 15
ISBN : 984-300-001757-6

মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সব
শহীদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
রক্ষার লড়াইয়ে নিবেদিতপ্রাণ সব
যোদ্ধার প্রতি উৎসর্গ

মুখবন্ধ

আজাদুর রহমান চন্দন যে এমন দুরূহ কাজ হাতে নিয়ে বসে আছেন তা আমি ভাবতেও পারিনি। স্বল্পবাক, শান্ত এবং নিরীহ এই চমৎকার মানুষটির ভেতরে যে এতো তীব্র যন্ত্রণা এবং ক্রোধ জমে আছে বুঝি কী করে! যখন আমার কাছে তিনি হাজির করলেন একটি গোটা পাণ্ডুলিপি, আমি তো অবাক! 'যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১' শিরোনামের পাণ্ডুলিপিটি দেখে চেয়ে নিলাম ওটা। টানা দেড় রাত লেগেছে আমার খসড়াটি পড়ে শেষ করতে। তিনটি অধ্যায় আছে তাতে—এক. একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ : অঢেল প্রমাণ, দুই. জামায়াতীদের অপরাধ চাপা দেওয়া যাবে না, এবং তিন. হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট : মগ্ন মৈনাকচূড়া। এছাড়া পরিশিষ্টে রয়েছে অনেক প্রামাণ্য দলিল এবং বেশ কিছু আলোকচিত্র যা এই গ্রন্থটিকে যৌক্তিকতা দিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধের বিষয়টিকে অহেতুক বিতর্কিত করার চেষ্টা করে চলেছে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা—বিশেষ করে জামায়াত। অমরা জানি সেটা ওরা চাইবেই। কিন্তু যখন এক শ্রেণীর রাজনীতিক কিংবা বুদ্ধিজীবীদেরও বলতে শুনি যে, থাক না ওসব, কী হবে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে, এখন সবার উচিত মিলে মিশে দেশটাকে গড়ে তোলা—তখন অবাক হয়ে যাই। যারা এ দেশের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, যারা মুক্তিযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ কিংবা ভারতীয় আগ্রাসন বলে অভিহিত করে, যারা বলে এ দেশে কোনো গণহত্যা হয়নি, এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পেছনে তাদের কেনো ভূমিকার কথা যারা অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে দেশ গড়তে হবে? ওরা কি সেই দেশ গড়বে, যে দেশ ধ্বংস করাই তাদের ব্রত? পৃথিবীর কোনো দেশ, পৃথিবীর কোনো জাতি কখনও সে দেশের স্বাধীনতাবিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধে সরাসরি জড়িত কোনো অপশক্তিকে বরদাশত করে না। গণহত্যা কিংবা ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগের মতো নারকীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিনা বিচারে চোখ বুজে ছেড়ে দেয় এমন নজিরও নেই কোথাও। অথচ আমাদের দেশে একটি বিশেষ চিহ্নিত মহল স্বাধীনতার পর থেকে এই তিন যুগেরও অধিককাল ধরে গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি চাপা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যখন গোটা দেশ জাগলো তখন যুদ্ধাপরাধীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তৎকালীন সরকার। এরপর এখন আবার উঠে আসছে যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি—ক্রমাগত এটা আবার গণমানুষের ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে। ঠিক এরকম একটি পটভূমিতে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। আজাদুর রহমান চন্দন এর পেছনে শ্রম দিয়েছেন প্রচুর, ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করেছেন নিঃশব্দে, প্রামাণ্য দলিলের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছেন এখানে ওখানে। শুনেছি কিশোর বয়স থেকেই তাঁর ভেতরে একটি বিশ্বাস বসবাস করতো এবং সেই বিশ্বাসই তাকে প্রাণিত করেছে এই গ্রন্থ রচনা করতে।

চন্দন মুক্তিযুদ্ধ করেননি এবং একাত্তরে তার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার বয়সও হয়নি। আমরা যারা সেদিন একাত্তরে যুদ্ধে গিয়েছিলাম তাদের ভেতরে একটা সংশয় ছিলো, আমাদের অবর্তমানে কারা বহন করবে একাত্তরের পতাকা। কিন্তু এখন আশ্বস্ত হই এই ভেবে যে, চন্দনরাই নতুন প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা আর এ পতাকা মানায় তাদের হাতেই।

প্রসঙ্গ : যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা ১৯৭১

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জন্য যেমন গৌরবের, পাকিস্তানিদের জন্য তেমনি লজ্জা ও অপমানের স্মারক। এ পরাজয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে যুদ্ধের পর পরই পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোপন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেন যা হামুদুর রহমান কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশন ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে মূল রিপোর্ট এবং পরে ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে সম্পূরক রিপোর্ট পেশ করলেও দীর্ঘ আড়াই দশকে পাকিস্তানের কোনো সরকার সেটি প্রকাশে আগ্রহ দেখায়নি। এক পর্যায়ে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে 'ইন্ডিয়া টুডে'র অনলাইন সংস্করণে সম্পূরক রিপোর্টটি ফাঁস করে দেওয়া হয়। তখন আমি 'সংবাদ'-এ কাজ করি। 'সংবাদ' সম্পূরক রিপোর্টটি বাংলায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশ করে। তখনকার বার্তা সম্পাদক সোহরাব ভাইয়ের বিশেষ আগ্রহে কাজটি আমাকেই করতে হয়। পরে সে বছরের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার পুরো রিপোর্ট প্রকাশ করলে পাকিস্তানি কয়েকটি পত্রিকার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাতে পাই। সেবারেও আমার হাত দিয়েই তা সংবাদ-এ প্রকাশিত হয় কয়েক কিস্তিতে। পরে রিপোর্টের আরো কিছু অংশ পাওয়া যায়। এছাড়াও তখন এ নিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখিও হয়। সংবাদ-এর তখনকার সহকর্মী আখতার ভাইয়ের বিপুল উৎসাহ ও তাগিদে এসব নিয়ে একটি বই করার উদ্যোগ নিই। কাজটি করে মজাও পাই যথেষ্ট। আখতার ভাই তখন বইটি প্রকাশের ব্যাপারে একটি প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে কথাও বলেন। পরে সোহরাব ভাইয়ের মাধ্যমে ওই প্রকাশনা সংস্থা পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে তা কম্পোজ এবং প্রুফ দেখার কাজও সেরে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি তারা বের করেনি।

গত কয়েক বছরে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে বেশ কিছু দলিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। একাত্তরে বাংলাদেশের ওপর বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সঙ্কলন অবশ্য আগে থেকেই ছিল। সব মিলিয়ে এবার হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট নিয়ে আগের লেখাটিসহ নতুনভাবে একটি বই করার কাজে হাত দিই নিজ তাগিদেই। নানা সমস্যা ও জটিলতায় বইটি প্রকাশে দেরি হয়ে গেছে। তারপরও 'সমকাল' সম্পাদক জনাব আবেদ খান—আমাদের প্রিয়-শ্রদ্ধেয় আবেদ ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় বইটি আজ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও আবেদ ভাই অসীম দরদে অত্যন্ত দ্রুত পাণ্ডুলিপি পড়ে বইটির জন্য একটি আবেগময় মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন, এজন্য তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। নানাভাবে এ কাজে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে ঋণী করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও গবেষক জনাব এ. এস. এম সামছুল আরেফিন।

এ কাজে নানারকম সহযোগিতা পেয়েছি সমকাল-এর বার্তা, কম্পিউটার ও সম্পাদনা সহকারী বিভাগের সহকর্মীদের কাছ থেকেও। আশৈশব হৃদ্যতার টানে পরম যত্নে বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন শিল্পী-স্বজন কামাল পাশা চৌধুরী। শেষে দ্রুত প্রকাশের কাজ সেরেছেন স্বরাজ প্রকাশনীর কর্ণধার জনাব রবিউল হোসেন কচি। কৃতজ্ঞতা রইলো সবার কাছেই।

আজাদুর রহমান চন্দন

বিষয়ক্রম

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা : অঢেল প্রমাণ	১৩
প্রধান ঘাতক-সহযোগী দল জামায়াত অপরাধ চাপা দেওয়ার সুযোগ নেই	৪৩
হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট : মগ্ন মৈনাকচূড়া	৬৭
শীর্ষস্থানীয় ঘাতক ও দালালরা	১৪১

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা : অঢেল প্রমাণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ও তার এদেশীয় দোসররা (জামায়াত, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি) গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, নির্যাতনের মতো জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করে দেশটিকে নরক বানিয়ে ফেলেছিল। পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকার, আল-বদররা সেদিন ছিল বাঙালি জনগণের কাছে যমদূতের চেয়েও ভয়ংকর। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বিদেশি সাংবাদিকদের বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়াসহ সংবাদ মাধ্যমের ওপর সামরিক জান্তার অতিমাত্রায় কড়াকড়ি আরোপের কারণে তাদের বর্বরতা ও নৃশংসতার খুব সামান্য খবরই তখন জানতে পারে বিশ্ববাসী। তারপরও কড়াকড়ির ফাঁক গলে নৃশংসতার যে অল্পবিস্তর তথ্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাতেই আতঙ্কে শিউরে ওঠেন বিশ্বের সব বিবেকবান মানুষ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ধিক্কারও উঠে দেশে দেশে। এমনকি খোদ পাকিস্তানে শান্তিপ্রিয় ও গণতন্ত্রমনা একজন বিশিষ্ট রাজনীতিকও সুর মেলান সেই ধিক্কার ও প্রতিবাদে। তিনি হলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক গোলাম জিলানি। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিলে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারই সুযোগ্য কন্যা পাকিস্তানের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেত্রী আসমা জাহাঙ্গীর ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এক নাগরিক সমাবেশে ওই চিঠির অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনান। পরে তার কাছ থেকে চিঠির একটি কপি পেয়ে 'প্রথম আলো' তা বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। মালিক গোলাম জিলানি চিঠিতে ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "বিশ্বের সংবাদপত্র ও রেডিও নেটওয়ার্কগুলো আজ পূর্ব পাকিস্তানে আপনার সেনাবাহিনীর তৎপরতার নিন্দায় সোচ্চার, ইতিহাসের আর কোনো ঘটনায় কখনো তাদের এমন অভিন্ন কণ্ঠ ও মুখর হতে দেখা যায়নি। 'গণহত্যা' শব্দটি অবাধে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং তা বিরামহীনভাবে চলছে। আপনার বিশাল প্রচারযন্ত্র দিয়ে আপনি দৃশ্যত এই

প্রচারণা মোকাবিলা করতে আদৌ সক্ষম হননি। আর আপনি রক্তপাতের যে ঝড় তুলেছেন তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখতে পাবেন যে, এসব অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসা আপনার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। প্রত্যেক পাকিস্তানির মুখের ওপর, না, প্রত্যেক পশ্চিম পাকিস্তানির মুখের ওপর সমগ্র বিশ্ব থু থু নিক্ষেপ করবে।"

এটা ছিল মালিক গোলাম জিলানির যুদ্ধের শুরুর দিকের উপলব্ধি। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২৫ বছর পর পাকিস্তানেরই আরেকজন নাগরিক শেহজাদ আমজাদ, যিনি লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার, একাত্তরের ঘটনাবলি সম্পর্কে তার উপলব্ধি প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের সম্মিলিত আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলাদেশিদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আমাদের তখনকার ব্যাখ্যাহীন নীরবতার জন্য যখন তাদের ওপর সন্ত্রাস চলছিল, হত্যা করা হচ্ছিল তাদের, নৃশংতভাবে মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছিল, গ্রামগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মাটির সঙ্গে, আমরা তখন চুপ করে ছিলাম।'

একাত্তরে গোটা বাংলাদেশকেই মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলেছিল হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা। মাত্র ৯ মাসে তারা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হন চার লাখের বেশি বাঙালি নারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন ভয়াবহ গণহত্যা দুনিয়ার আর কোথাও সংঘটিত হয়নি। ১৯৮১ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়, একাত্তরের বাংলাদেশে এতো অল্প সময়ে যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তেমনটি ইতিহাসে আর কোনো গণহত্যার বেলায় ঘটেনি। ওই সময় গড়ে প্রতিদিন ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়। গণহত্যার ইতিহাসে এটি দৈনিক গড় হত্যাকাণ্ডের সর্বোচ্চ সংখ্যা। খোদ জাতিসংঘের এ তথ্য ও অভিমত সত্ত্বেও কতিপয় পাকিস্তানির সঙ্গে সুর মিলিয়ে এ দেশের স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী ও নব্য-রাজাকাররা সংখ্যার মারপ্যাঁচসহ নানা কুযুক্তির আশ্রয়ে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে আড়াল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

একাত্তরে যত অপরাধ

১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার এ দেশীয় দোসররা যেসব অপরাধ করেছে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো হলো—যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যা। ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে—

১. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ : যেমন–সংঘটিত হওয়ার স্থানের অভ্যন্তরীন আইন ভঙ্গ করে বা না করে যে কোনো বেসামরিক নাগরিককে হত্যা, উচ্ছেদ, দাস বানানো, নির্বাসিত করা, কারারুদ্ধ করা, অপহরণ, অবরোধ, নির্যাতন, ধর্ষণ কিংবা অন্যান্য অমানবিক আচরণ করা অথবা রাজনৈতিক, গোত্রগত, জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে শাস্তি দেওয়া।

২. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ : যেমন–আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সূত্রপাত করা বা লিপ্ত হওয়া অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি, ঐকমত্য বা নিশ্চয়তাসমূহ লঙ্ঘন করে যুদ্ধ করা।

৩. গণহত্যা : কোনো জাতীয়, গোত্রগত, গোষ্ঠীগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিচের যে কোনো কাজ, অংশত বা পুরোপুরি সংঘটিত করা বোঝাবে এবং অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন–

ক) দলের সদস্যদের হত্যা করা;
খ) দলের সদস্যদের দৈহিক বা মানসিক দিক থেকে গুরুতর ক্ষতি করা;
গ) ইচ্ছাকৃতভাবে আংশিক বা পূর্ণভাবে দৈহিক ধ্বংস সাধনের পরিকল্পনা করে দলীয় জীবনে আঘাত হানা;
ঘ) দলের মধ্যে জন্মরোধ করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দলের শিশুদের জোর করে অন্য দলে স্থানান্তর করা;

৪. যুদ্ধাপরাধ : যুদ্ধের আইন বা প্রথা ভঙ্গ করা, এতে অন্তর্ভুক্ত তবে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বেসামরিক লোকদের হত্যা, তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ অথবা ক্রীতদাসের মতো শ্রম বা অন্য যে কোনো কাজে নিয়োজিত করা; যুদ্ধবন্দী বা নাবিকদের হত্যা বা তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করা, জিম্মি ও বন্দীদের হত্যা করা, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, ইচ্ছাকৃতভাবে নগর, শহর বা গ্রামের ধ্বংস সাধন করা অথবা সামরিক প্রয়োজনকে ন্যায্যতা দেয় না এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো।

একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনী ও তার এ দেশীয় দোসরদের হাতে খুন হওয়া বাঙালির সংখ্যা যাই হোক না কেন ওটা যে গণহত্যা ছিল তা অস্বীকার করে লাভ হবে না। গণহত্যার অপরাধটিকে সংখ্যার মারপ্যাঁচে খাটো করার সুযোগ নেই। কারণ গণহত্যা (Genocide) মানে শুধু ব্যাপক হত্যা (Mass killing) বা নির্বিচার হত্যা নয়। জাতিসংঘের জেনেভা কনভেনশনে গণহত্যার

সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'জেনোসোইড বলতে বোঝাবে কোনো জাতি বা জাতিসত্তা, বর্ণ বা ধর্মীয়গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশবিশেষকে বা পুরোপুরি ধ্বংস করার লক্ষে পরিচালিত নিম্নবর্ণিত কাজের যে কোনো একটি–

ক. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা;
খ. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর মানসিক বা শারীরিক ক্ষতিসাধন;
গ. উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে জাতি বা গোষ্ঠীর ওপর এমন এক জীবনযাত্রা আরোপ যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গোষ্ঠীর ধ্বংস ডেকে আনবে;
ঘ. জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মপ্রথা নিরোধের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া;
ঙ. জাতি বা গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য জাতি বা গোষ্ঠীতে স্থানান্তর।'

হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ও তার এ দেশীয় সহযোগীরা (Auxiliary forces) উল্লিখিত অপরাধের বেশিরভাগই সংঘটিত করেছে একাত্তরে। গণহত্যাসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধে তারা তখন ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল এমনটি নয়। বরং অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করেই তারা এ হত্যাযজ্ঞসহ মানবতাবিরোধী নানা অপরাধ সংঘটিত করে।

আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও সূত্রপাত

মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক রবার্ট পেইন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানে জেনারেলদের এক সভায় আওয়ামী লীগ ও এর সমর্থকদের যে কোনো মূল্যে দমন করার (To crush the awami league and its supporters) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দেন, 'Kill three million of them and the rest will eat out of our hands.' (ওদের ৩০ লাখ লোককে খতম করে ফেলুন, অন্যরা আমাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে।) রবার্ট পেইন আরো লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে যে-পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ঘটানো হয়েছে তার নির্দেশ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছ থেকে এলেও এর ধারক-বাহক ছিলেন লে. জেনারেল টিক্কা খান। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকা ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাওয়ার সময় ইয়াহিয়া খানের মন্তব্য ছিল বিদ্রোহী মানুষগুলোকে শেষ করে ফেলুন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে টিক্কা খান পরের ছয়টি মাস ধরে এ আদেশটি পালন করে গেছেন।'

পাকিস্তান বাহিনীর তখনকার পিআরও সিদ্দিক সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর আগ্রাসনমূলক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও সূত্রপাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বইটিতে দেখা যায়, আগ্রাসনের

প্রাথমিক পরিকল্পনা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসেই। ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সম্মেলন ডাকেন ইয়াহিয়া। তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে যোগ দেন লে. জেনারেল ইয়াকুব ও ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরে ইয়াকুব তার স্টাফকে নির্দেশ দেন 'ব্লিৎস' নামের অপারেশন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পিআইএর বিমানে করে ২৭ বালুচ ও ১৩ ফ্রন্টিয়ার্স পদাতিক ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করে। ১ মার্চ পর্যন্ত চলে সৈন্য আনার প্রক্রিয়া। স্থানীয় ব্রিগেড সদর দপ্তরকে (৫৭ ব্রিগেড) বলা হয় অতিরিক্ত সৈন্যদের গ্রহণ করে নতুন অপারেশনাল প্লান অনুযায়ী তাদের একীভূত করে নিতে।

অপারেশন সার্চলাইট প্রণয়ন করা হয় ১৮ থেকে ২০ মার্চ ঢাকায়। পরে কিছু সংশোধনী এনে ২৪ মার্চ পরিকল্পনাটি সেনা কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, একাত্তরের ১৭ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সিওএস জেনারেল হামিদ টেলিফোনে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে অপারেশনের পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব দেন। অপারেশনের মূল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্য ১৮ মার্চ সকালে ঢাকা সেনানিবাসে জিওসির অফিসে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে তাঁরা একমত হন, অপারেশনের লক্ষ্য হবে শেখ মুজিবুর রহমানের 'ডিফ্যাক্টো' শাসন উৎখাত এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ওই বৈঠকেই জেনারেল রাও ফরমান আলী হালকা নীল কাগজের অফিসিয়াল প্যাডে একটি সাধারণ কাঠপেনসিল দিয়ে নতুন পরিকল্পনার প্রথম অংশ লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় অংশটি লেখেন জেনারেল রাজা। তাতে অপারেশনের প্রয়োজনীয় সমর

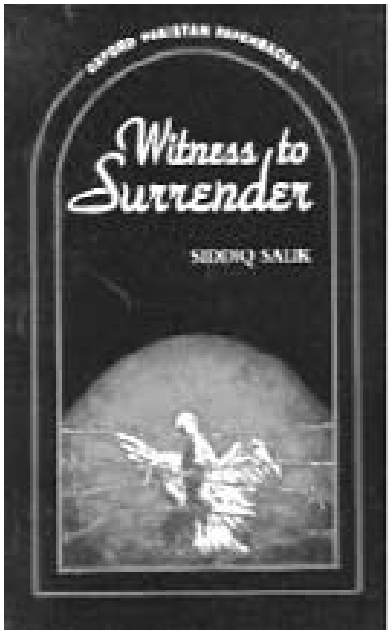

উপাদানের বণ্টন এবং বিভিন্ন ব্রিগেড ও ইউনিটের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৬ প্যারা সংবলিত পাঁচ পৃষ্ঠার এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। পরিকল্পনায় তিনটি মূল বিষয় ছিল। এক. নিয়মিত ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টসহ সব বাঙালি সেনাকে নিরস্ত্র করা। দুই. বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকরত অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করা। তিন. তালিকাভুক্ত আরো ১৬ জন প্রখ্যাত ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা। ২০ মার্চ বিকেলে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ফ্লাগ স্টাফ হাউসে জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সামনে হাতে লেখা পরিকল্পনাটি পড়া হয়। দুজনেই পরিকল্পনার প্রধান ধারাগুলো অনুমোদন করেন। কিন্তু জেনারেল হামিদ বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করা এবং পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিকল্পনা থেকে 'নির্ধারিত তারিখে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকরত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার' করার বিষয়টি বাতিল করে দেন। (In the same sitting, General Farman wrote down the new plan on a light blue office pad, using an ordinary school pencil. I saw the original plan in General Farman's immaculate hand. General Khadim wrote its second part, which dealt with distribution of resources and the allocation of tasks to brigades and units. The plan, christened 'Operation SEARCHLIGHT', consisted of sixteen paragraphs. ...It presumed that all Bengali troops, including regular East Bengal battalions, would revolt in reaction to its execution. They should therefore, be disarmed. Secondly, the 'non-cooperation' movement launched by Mujib should be deprived of its leadership by arresting all the prominent Awami League leaders while they were in conference with the President. ...The hand-written plan was read out to General Hamid and Lieutenant-General Tikka Khan at Flagstaff House on the afternoon of 20 March.)

২৪ মার্চ পরিকল্পনাটি প্রথম প্রকাশ করা হয় সংশ্লিষ্ট সেনা কমান্ডারদের কাছে। ঢাকার বাইরে অবস্থানরত ব্রিগেড কমান্ডারদের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য সে দিনই ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে জেনারেল ফরমান যশোরে এবং জেনারেল খাদিম কুমিল্লায় যান। ফরমান যশোরে ব্রিগেডিয়ার দুররানিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। আর খাদিম কুমিল্লায়

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান চট্টগ্রামে। সেখানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতিমীর কাছে গোপনে নির্দেশটি পৌঁছে দেন এবং আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সিনিয়র অফিসার মজুমদারকে কৌশলে ঢাকায় ফিরিয়ে আনেন। অন্য সিনিয়র সেনা কর্মকর্তারা ঢাকা থেকে বিমানে সিলেট, রংপুর ও রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে যান।

ঢাকার ৫৭ ব্রিগেড ২৪ মার্চ থেকে খুবই গোপনে আঘাতের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করে। এ কাজে তারা বেসামরিক গাড়ি ও পোশাক ব্যবহার করেছিল।

অপারেশন সার্চলাইট-এর নির্দেশ ঢাকার বাইরে ও ভেতরে গ্যারিসনগুলোতে টেলিফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বার্তা প্রেরণের জন্য তারা একটি ব্যক্তিগত সাংকেতিক বার্তা তৈরি করেছিল। রাও ফরমান আলী তাঁর হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছিলেন ইংরেজিতে এবং সেগুলো প্রথমে তিনি টেপরেকর্ডারে ধারণ করেন এবং পরে ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেন।

লিখিত আকারে তৈরি অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনাটি ছিল মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে অপারেশনাল অনুক্রমে চারটি ধারা ছিল। ধারা-১১ (ক) আঘাত হানার সময়: এক প্লাটুন সেনা নিয়ে মুজিবের বাড়িতে হানা রাত ১টা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিকল রাত ১২টা ৫৫ মিনিট, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ডন করার জন্য নির্ধারিত সেনাদের যাত্রা রাত ১টা ০৫ মিনিট, রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তর ও কাছাকাছি অন্যান্য থানার জন্য নির্ধারিত সেনাদের যাত্রা ১টা ০৫ মিনিট, মিসেস আনোয়ারা বেগমের বাড়ি, রোড নং ২৯ এবং বাড়ি নং ১৪৮, রোড নং ২৯; সান্ধ্য আইন জারি করতে হবে রাত ১১টায় সাইরেন বাজিয়ে এবং লাউড স্পিকারের মাধ্যমে। (খ) দিনের বেলায় (২৬ মার্চ) অপারেশনের মধ্যে ছিল—ধানমণ্ডির সন্দেহজনক প্রতিটি বাড়ি এবং পুরান ঢাকার হিন্দুদের বাড়িতে অনুসন্ধান, সব ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া, একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, টিঅ্যান্ডটি, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সাইক্লোস্টাইল মেশিন বাজেয়াপ্ত করা এবং অন্য নেতাদের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা। ১৩ নং ধারায় ছিল শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম এ জি ওসমানী, সিরাজুল আলম খান, এম এ মান্নান, আতাউর রহমান, অধ্যাপক মোজাফফর, অলি আহাদ, মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ, ফয়জুল হক, তোফায়েল আহমদ, এন এ সিদ্দিকী, রউফ, আব্দুল কুদ্দুস মাখনসহ অন্য ছাত্রনেতাদের অবস্থান সম্পর্কে জানা।

অন্যদিকে পরিকল্পনায় 'কৌশলগত' দিক সম্পর্কে বলা ছিল—(ক)-১. শেখ মুজিবের বাড়ি ভেঙে ঢুকতে হবে এবং উপস্থিত সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ হলসমূহ ঘেরাও করতে হবে। তিন. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করতে হবে। চার. যে বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (খ) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অচল করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সেনাদের কোনো কার্যক্রম চলবে না। (গ) অপারেশনের রাতে ১০টার পর কাউকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। (ঘ) যেকোনো অজুহাতেই হোক শহরের ভেতর অবস্থানরত সেনাদের প্রেসিডেন্ট হাউস, গভর্নর হাউস, এম এন এ হোস্টেল এলাকাসহ রেডিও-টিভি এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রাঙ্গণে সমাবেশ ঘটাতে হবে। (ঙ) মুজিবের বাড়িতে অপারেশন চালানোর জন্য বেসামরিক গাড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনায় ঢাকা অঞ্চলে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মেজর জেনারেল কে এইচ রাজাকে গণহত্যা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে।

ইয়াহিয়ার নির্দেশেই যে পাকিস্তানি জেনারেলরা বাংলাদেশে গণহত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে আড়ালে সামরিক অভিযানের মাধ্যমেই বাঙালিদের দমন করার ফন্দি আঁটছিলেন সে কথা স্বীকার করা হয়েছে পাকিস্তান সরকারের গঠন করা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও।

খুলে গেল নরকের দরজা : সিদ্দিক সালিক

ওই নীলনকশা অনুযায়ীই একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ বাঙালি জনগণের ওপর। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থেই ওই অভিযানের ভয়াবহ বিবরণ রয়েছে। বইটিতে বলা হয়েছে, 'সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—অগ্নিশিখা আকাশকে বিদ্ধ করছিল। এক সময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠল আগুনের লকলকে শিখা।' ২৫ মার্চ রাতের অভিযান (অপারেশন সার্চলাইট) শুরুর বর্ণনা দিয়ে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আঘাত হানার নির্ধারিত মুহূর্ত (এইচ-আওয়ার) পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। খুলে গেল নরকের

দরজা।' তার ভাষায়, 'ঢাকাকে এক রাতেই অসাড় করে দেওয়া হলো।'

ঢাকার বাইরের সামরিক অভিযান সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'প্রধান শহরগুলোর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদেশের অন্যান্য শহরে শক্তিশালী সেনাদল পাঠানো হয়। ১ এপ্রিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল যায় একটি সেনাদল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতেই চাই। প্রধান সেনাদলটি মেশিনগান সজ্জিত ট্রাকে করে যাচ্ছিল। রাস্তা ছেড়ে ৫০০ মিটার দূর দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঁটছিল অন্য দুটি কোম্পানি। কোম্পানি দুটি সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এবং অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ও নিস্তেজকরণের রণসজ্জায় ছিল সজ্জিত। তাদের ক্রোধের আগুন থেকে কিছুই রেহাই পাবে না। পদাতিক দল সামান্যতম অজুহাতে কিংবা সন্দেহে গুলিবর্ষণ করে চলল। গাছের পাতা নড়ার শব্দে কিংবা কোনো বাড়ির ভেতর থেকে আসা শব্দে মেশিনগানের ব্রাশফায়ার হতে থাকল। যেখানে ব্রাশফায়ার হলো না সেখানে অন্তত রাইফেলের গুলিবর্ষণ হলো। টাঙ্গাইল রোডের উপর করটিয়ার কাছাকাছি ছোট একটি জনপদ ছিল। একটি অখ্যাত জনপদ। সেখানকার ঘটনা আমার মনে আছে। অনুসন্ধানী সৈনিকরা জনপদটির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। কাছাকাছি বাঁশঝাড়গুলোও আগুন থেকে রেহাই পেল না। আগুন লাগিয়ে কিছু দূর এগিয়েছে মাত্র—এ সময় আগুনের তাপে প্রচণ্ড শব্দ করে একেকটি বাঁশ ফাটতে থাকল, আর সবাই এ শব্দকে লুকিয়ে থাকা দুষ্কৃতকারীর রাইফেলের গুলি বলে মনে করল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো সেনাদলটি তাদের সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনপদটিকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য। সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হলো বাঁশ ঝাড়টিতে।... করটিয়া একটি ছোট্ট শহর। নাম না জানা নানা বুনো গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা। একসারি দোকানঘরের একটি বাজার নিয়ে শহরটি। লোকজন আগেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল তারা? খুঁজে বের করা সমস্যার ব্যাপার। সেনাদলটি সেখানে থামল। শহরটি ভালো করে খুঁজে দেখল। তারপর বাজারটি জ্বালিয়ে দিল। কয়েকটি কেরোসিনের টিনে আগুন লাগানো হলো। দ্রুত বাজারটি এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। ধূম্রকুণ্ডলীসহ আগুন লকলকিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে উপরে উঠল।'

বইয়ের আরেক জায়গায় সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'এই সেনাবাহিনী নিয়ে বাঙালিদের প্রতিরোধের মেরুদণ্ড ভাঙতে জেনারেল নিয়াজির বেশি সময় লাগলো না। এপ্রিলের শেষ নাগাদ তিনি প্রধান শহরগুলোর দখলকাজ সম্পন্ন করেন। পরবর্তী মাসে সন্দেহজনক পকেটগুলো নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ছোটখাট অপারেশন পরিচালনায় মনোনিবেশ করা হলো। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শান্ত ও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত এ সময়কে এমন কোনো গঠনমূলক প্রচারাভিযানে ব্যবহার

করা হলো না, যাতে বাঙালিদের মন জয় করা যায়। পরে তাদের ক্ষত আরো দগদগে করে তোলা হলো সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে।'

বেছে বেছে গণহত্যা : মার্কিন গোপন দলিলের শিরোনাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতম মিত্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা তখন পাকিস্তানকে অস্ত্রও জোগান দিয়েছে বাঙালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সেই যুক্তরাষ্ট্রেরই তখনকার ঢাকাস্থ কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড ঢাকা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ গণহত্যার বিবরণ দিয়ে অসংখ্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। একটি টেলিগ্রামের শিরোনামই ছিল 'Selective genocide' অর্থাৎ বেছে বেছে গণহত্যা। ২৮ মার্চ পাঠানো ওই টেলিগ্রামে বলা হয় :

1. Here in Decca we are mute and horrified witness to a reign of teror by the Pak(istani) Military. Evidence continues to mount that the MLA authorities have list of AWAMI League supporters whom they are systematically eliminating by seeking them out in their homes and shooting them down.

(ঢাকায় পাক সেনারা যে-সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে আমরা তার নীরব ও আতঙ্কগ্রস্ত সাক্ষী। এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ ক্রমেই বাড়ছে যে, মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের কাছে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি তালিকা আছে আর সেই তালিকা ধরে ধরে তাদের বাড়ি থেকে ডেকে এনে গুলি করে সুচারুভাবে হত্যা করা হচ্ছে।)

2. Among those marked for extinction in addition to the A.L. hierarchy are student leaders and university faculty. In this second category we have reports that Fazlur Rahman, head of the philosophy department and a Hindu, M. Abedin, head of the department of history, have been killed. Razzak of the political science department is rumored dead. Also on the list are the bulk of MNA's elect and numbers of MPA's.

(খতমের জন্য যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া আছেন ছাত্রনেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। এ দ্বিতীয় ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা খবর পাচ্ছি যে দর্শন বিভাগের প্রধান ফজলুর রহমান ও একজন হিন্দু এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান এম আবেদীনকে হত্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রাজ্জাককেও মেরে ফেলা হয়েছে বলে গুজব আছে। এ তালিকায় আরো আছে বহু নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএর নাম।)

3. Moreover, with the support of the Pak(istani) Military, non-Bengali Muslims are systematically attacking poor peoples

quarters and murdering Bengalis and Hindus.
(এছাড়া পাক সেনাদের মদদে অবাঙালি মুসলিমরা নিয়ম করে দরিদ্র লোকজনের বাড়িঘর আক্রমণ করছে এবং খুন করছে বাঙালি ও হিন্দুদের।)

পরে এক লেখায় আর্চার কে ব্লাড উল্লেখ করেন, "আমরা অনুভব করলাম, বাঙালি মুসলমানদের সকল হত্যাকেই 'গণহত্যা' বলে বিশেষায়িত করাটা যথাযথ হবে না।

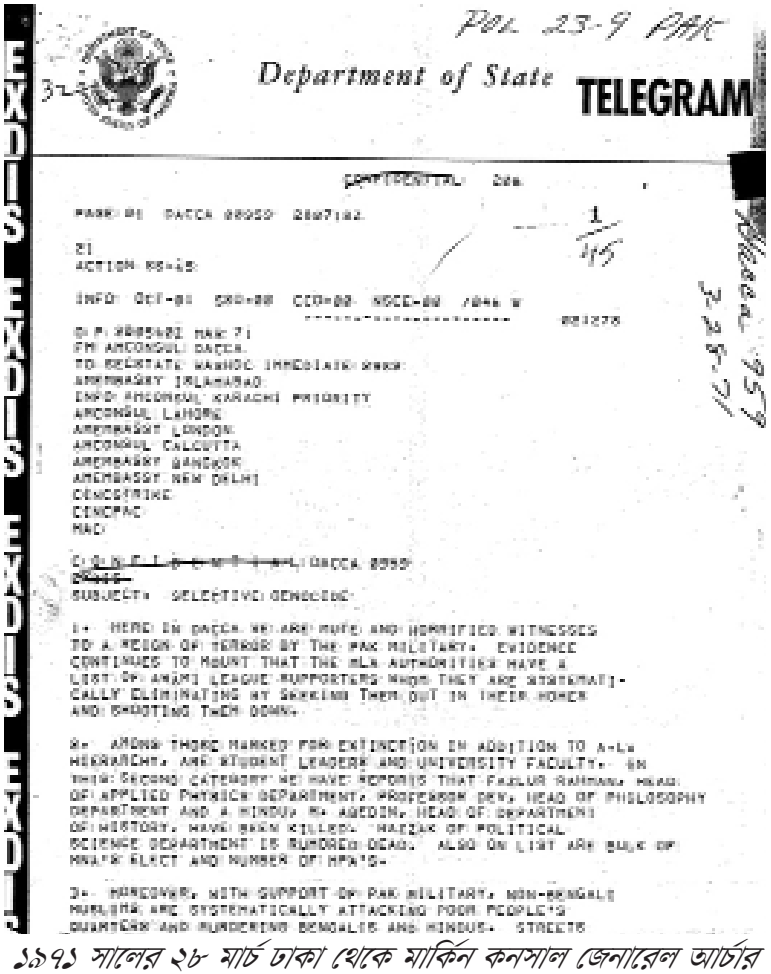

EXDIS EXDIS EXDIS EXDIS

POL 23-9 PAK

Department of State TELEGRAM

CONFIDENTIAL

PAGE 01 DACCA 00959 280710Z

21
ACTION SS-45

INFO OCT-01 SSO-00 CCO-00 NSCE-00 /046 W

O P 280540Z MAR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMCONSUL KARACHI PRIORITY
AMCONSUL LAHORE
AMEMBASSY LONDON
AMCONSUL CALCUTTA
AMEMBASSY BANGKOK
AMEMBASSY NEW DELHI
CINCSTRIKE
CINCPAC
MAC

C O N F I D E N T I A L DACCA 0959
EXDIS
SUBJECT: SELECTIVE GENOCIDE

1. HERE IN DACCA WE ARE MUTE AND HORRIFIED WITNESSES TO A REIGN OF TERROR BY THE PAK MILITARY. EVIDENCE CONTINUES TO MOUNT THAT THE MLA AUTHORITIES HAVE A LIST OF AWAMI LEAGUE SUPPORTERS WHOM THEY ARE SYSTEMATICALLY ELIMINATING BY SEEKING THEM OUT IN THEIR HOMES AND SHOOTING THEM DOWN.

2. AMONG THOSE MARKED FOR EXTINCTION IN ADDITION TO A.L. HIERARCHY, ARE STUDENT LEADERS AND UNIVERSITY FACULTY. IN THIS SECOND CATEGORY WE HAVE REPORTS THAT FAZLUR RAHMAN, HEAD OF APPLIED PHYSICS DEPARTMENT, PROFESSOR DEV, HEAD OF PHILOSOPHY DEPARTMENT AND A HINDU, M. ABEDIN, HEAD OF DEPARTMENT OF HISTORY, HAVE BEEN KILLED. RAZZAK OF POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT IS RUMORED DEAD. ALSO ON LIST ARE BULK OF MNA'S ELECT AND NUMBER OF MPA'S.

3. MOREOVER, WITH SUPPORT OF PAK MILITARY, NON-BENGALI MUSLIMS ARE SYSTEMATICALLY ATTACKING POOR PEOPLE'S QUARTERS AND MURDERING BENGALIS AND HINDUS. STREETS

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডের ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবার্তা, যার শিরোনাম ছিল 'সিলেকটিভ জেনোসাইড'

লড়াই জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষই নৃশংসতা চালাচ্ছিল। যদিও বিনা উস্কানিতে সেনাবাহিনীর গুলি চালানোর খবর আমরা তখনো পাচ্ছিলাম। তবে মনে হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করতে সামরিক উদ্দেশে সেনাবাহিনী তার সহিংসতা আরো বাড়িয়ে চলেছে। অপরদিকে, বেছে বেছে হিসাব করে হিন্দুদের ওপর নগ্ন হামলার বর্ণনায় 'গণহত্যা' শব্দটি সবচেয়ে কার্যকর মনে হলো। এরপর থেকে আমাদের রিপোর্টে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের বিষয়টি উল্লেখ করার সময় 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করলাম।"

মার্কিন গোপন দলিল-২ : প্রথমে বাড়িঘরে আগুন পরে গুলি করে হত্যা

একাত্তরের ২৯ মার্চ ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে যে টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে উল্লেখ আছে, 'মনে হচ্ছে হিন্দুরাই সামরিক অভিযানের বিশেষ লক্ষ্য, যদিও হিন্দু অধ্যুষিত নয় এমন এলাকাও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে।' আমেরিকান যাজকদের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্লাডের ওই টেলিগ্রাম বার্তায় বলা হয়, পুরান ঢাকায় কিছু ব্যারিকেড ছাড়া বাঙালিদের দিক থেকে কোনো উস্কানি না থাকা সত্ত্বেও অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ করে লোকজনকে হত্যা করেছে সৈন্যরা। সৈন্যদের কৌশলটা ছিল, প্রথমে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। প্রাণ বাঁচাতে ওইসব বাড়ির বাসিন্দারা বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে তখন তাদের গুলি করে মারা। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ১১ সদস্যের একটি পরিবারের সবাইকে গুলি করে মারার তথ্যও আছে ওই টেলিগ্রামে। ১৯৯৮ সালে দলিলটির ওপর থেকে গোপনীয়তা তুলে নিয়ে আর্কাইভে উন্মুক্ত করে দেয় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলের নেতা-কর্মী, বাঙালি ছাত্র-যুবক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায় যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও এর স্থানীয় দোসরদের হত্যা-নির্যাতনের বিশেষ শিকার ছিল এর প্রমাণ আছে একাত্তরের অন্যান্য মার্কিন গোপন দলিলেও।

মার্কিন গোপন দলিল-৩ : পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুমুক্ত করার নীতি

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী মতাদর্শগতভাবেই হিন্দুবিরোধী। তারা মনে করে, হিন্দুদের ভারতে চলে যাওয়াই উচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যরা যে দমন অভিযান চালাচ্ছে তার বিশেষ লক্ষ্য হিন্দু সম্প্রদায়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তাই এখন নেই।' একাত্তরে একটি গোপন মার্কিন দলিলে এভাবেই তুলে ধরা হয় অধিকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাম্প্রদায়িক দমননীতির চিত্র। আর জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এ ধরনের

দমন-পীড়ন যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ।

পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বর চার পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট

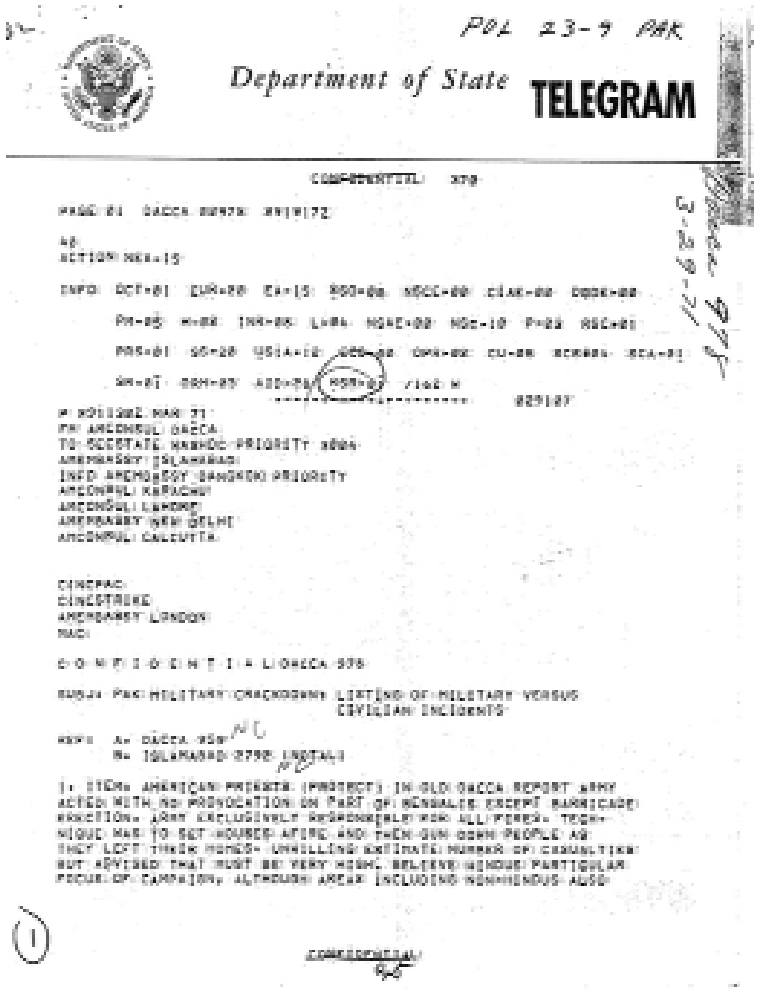

POL 23-9 PAK
Department of State TELEGRAM
CONFIDENTIAL
PAGE 01 DACCA 00978 291017Z
ACTION NEA-15
INFO OCT-01 EUR-20 EA-15
AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMEMBASSY BANGKOK PRIORITY
AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE
AMEMBASSY NEW DELHI
AMCONSUL CALCUTTA
CINCPAC
CINCSTRIKE
AMEMBASSY LONDON
MAC
C O N F I D E N T I A L DACCA 978
SUBJ: PAK MILITARY CRACKDOWN: LISTING OF MILITARY VERSUS CIVILIAN INCIDENTS
REF: A. DACCA 959
B. ISLAMABAD 2790
1. ITEM: AMERICAN PRIESTS (PROTECT) IN OLD DACCA REPORT ARMY ACTED WITH NO PROVOCATION ON PART OF BENGALIS EXCEPT BARRICADE ERECTION. ARMY EXCLUSIVELY RESPONSIBLE FOR ALL FIRES. TECHNIQUE WAS TO SET HOUSES AFIRE AND THEN GUN DOWN PEOPLE AS THEY LEFT THEIR HOMES. UNWILLING ESTIMATE NUMBER OF CASUALTIES BUT ADVISED THAT MUST BE VERY HIGH. BELIEVE HINDUS PARTICULAR FOCUS OF CAMPAIGN, ALTHOUGH AREAS INCLUDING NON-HINDUS ALSO
CONFIDENTIAL

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবার্তা

দেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মরিস জে উইলিয়ামস। রিপোর্টে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এগুলো হলো (ক) পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়া, (খ) পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নীতি ও অভিযান, এবং (গ) ইয়াহিয়া খানের কূটনীতির বিষয়বস্তু ও রূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের একটি উপ-অনুচ্ছেদের শিরোনাম হলো 'পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুমুক্ত করার নীতি সেনাবাহিনীর।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাম্প্রদায়িক দমননীতির কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার তথ্যও উল্লেখ আছে ওই মার্কিন গোপন রিপোর্টে। রিপোর্ট মতে, জেনারেল ফরমান আলী খানও স্বীকার করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের ৮০ শতাংশ সদস্যই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে গেছে। ফরমান অফ দ্য রেকর্ড (গোপন রাখার শর্তে) জানান, ৬০ লাখের মতো লোক দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগে' নাগাদ আরো ১৫ লাখ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিতে পারে। ইউএসএআইডির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫ লাখের মতো সদস্যই অবশিষ্ট ছিল।

মার্কিন গোপন দলিল-৪ : বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড

বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু সম্প্রদায় যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্মূল অভিযানের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তার প্রমাণ আছে ওই সময়ের আরো মার্কিন গোপন দলিলেও। ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডের ওয়াশিংটনে পাঠানো একটি টেলিগ্রাম বার্তার শিরোনামই ছিল 'বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড'। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ পাঠানো ওই বার্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং পলায়নরত ছাত্রীদের মেশিনগান দিয়ে গুলি করে মারার বিবরণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যার তথ্যও রয়েছে।

ওই দলিলে বলা হয়, ফ্যাকাল্টি মেম্বার (শিক্ষক), ছাত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজারের মতো লোককে হত্যা করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, 'আমরা নিশ্চিত খবর পেয়েছি, একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে হত্যা করা হয়েছে তাঁর নিজের বাসায়।'

এর আগের দিন অর্থাৎ ২৯ মার্চ পাঠানো টেলিগ্রাম বার্তায় আর্চার ব্লাড সামরিক অভিযানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ডিনসহ ছয়জন শিক্ষককে হত্যার তথ্য দেন। ওই বার্তায় নিহতদের মধ্যে ড. জি সি দেবের নাম উল্লেখ করা হয়।

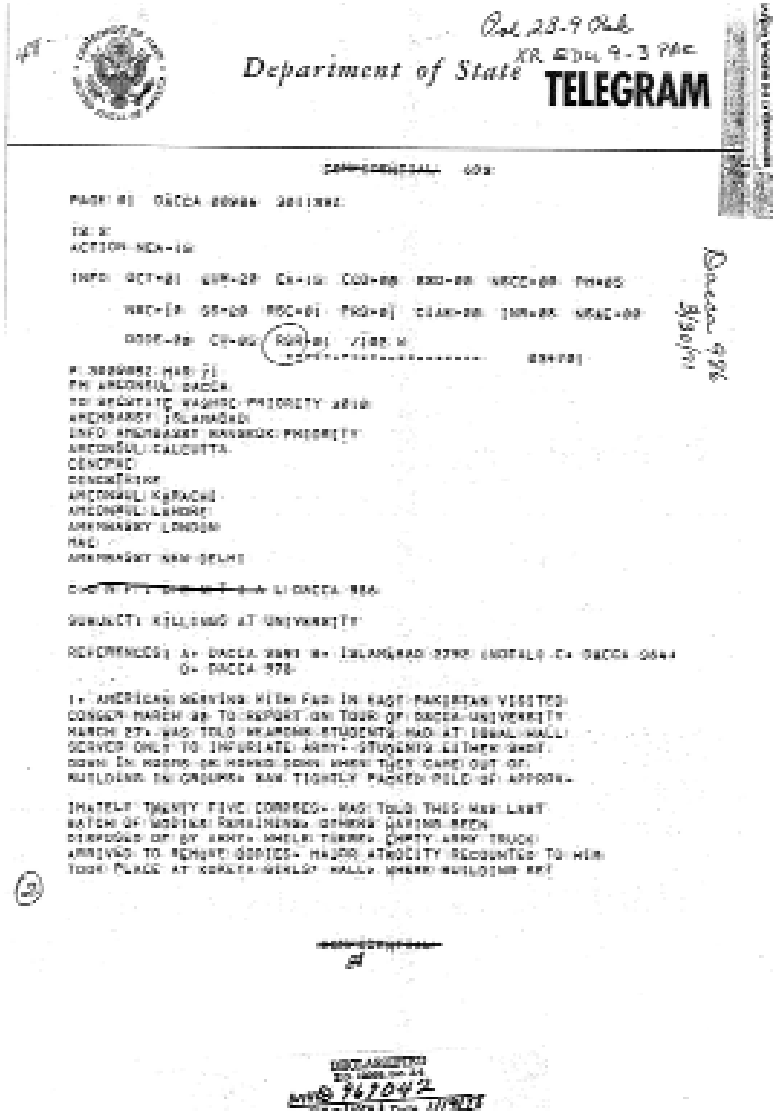

Department of State TELEGRAM

AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE
AMEMBASSY LONDON
AMEMBASSY NEW DELHI

SUBJECT: KILLINGS AT UNIVERSITY

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ঢাকা থেকে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবার্তা, যার শিরোনাম ছিল 'কিলিং অ্যাট ইউনিভার্সিটি'

মার্কিন গোপন দলিল-৫ : বুদ্ধিজীবীদের ধরপাকড়

'আগের চেয়ে কিছুটা কম মাত্রায় হলেও পূর্ব পাকিস্তানি (বাঙালি) বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমন-পীড়ন চলছেই। মার্চ মাসেই শুরু হয়েছিল এ দমন অভিযান। এখন দমন-পীড়ন চলছে অনেকটা বেছে বেছে।' এক মার্কিন গোপন দলিলে এ তথ্য রয়েছে।

'পূর্ব পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের ধরপাকড়' শিরোনামে একাত্তরের ১৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি গোপন টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমন-পীড়নের কয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয় ওই টেলিগ্রাম বার্তায়। কয়েক বছর আগে ওই দলিলের ওপর থেকে গোপনীয়তা তুলে নেওয়া হয়েছে। দলিলটি সংরক্ষিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি আর্কাইভে।

ফারল্যান্ডের ওই টেলিগ্রাম বার্তায় বলা হয়, নামকরা পূর্ব পাকিস্তানি (বাঙালি) আইনজীবী, স্কলার ও লেখক কামরুদ্দীন আহমদকে ৬ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরদিনই এ ঘটনা ঘটল। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কয়েকটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৭ জন ছাত্র, কর্মকর্তা ও ফ্যাকাল্টি সদস্যকে (শিক্ষক) গ্রেপ্তার কিংবা সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার সরদার ফজলুল করিম এবং চট্টগ্রামের এক ছাত্রনেতা। মধ্য আগস্টের পর থেকে এসব ধরপাকড় হয়েছে বলে টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

ওই দমন-পীড়নের জন্য ফারল্যান্ড অবশ্য পাকিস্তান সরকারের (জিওপি) শীর্ষ মহলকে দায়ী করেননি। তিনি দায়ী করেন বাংলাদেশে নিয়োজিত সেনাকর্মকর্তা, পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে। ফারল্যান্ডের দাবি, ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া সরকার পূর্ব পাকিস্তানে দমন-পীড়ন কমিয়ে সমঝোতার দিকে অগ্রসর হওয়ার মনোভাব পোষণ করলেও মাঠপর্যায়ে (অপারেশনাল লেভেল) এই পরিবর্তিত মনোভাবের বার্তাটি ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না।

রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড তাঁর টেলিগ্রাম বার্তায় উল্লেখ করেন, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সামগ্রিক দমন-পীড়ন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথা পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বারবার তাঁরা তুলে ধরেছেন।

দলিলটিতে ড. আবদুস সাত্তারের গ্রেপ্তারের বিষয়টিও উল্লেখ আছে। তবে ফারল্যান্ড দাবি করেন, ড. সাত্তারকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিডনি শ্যনবার্গের ভাষ্য

মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শ্যনবার্গের জবানিতেও একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। ওই সময় তিনি ছিলেন 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর দক্ষিণ এশীয় প্রতিনিধি। মুক্তিযুদ্ধের ওপর সংবাদ পরিবেশের কারণে তাকে ওই সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল। পরে একটি প্রামাণ্যচিত্রে তিনি বলেছেন, 'আমি যা দেখেছিলাম সেটা ছিল স্পষ্টতই গণহত্যা। হত্যার লক্ষ্য ছিল বাঙালিরা, বিশেষভাবে হিন্দুরা। যেসব শহরে আমি গিয়েছিলাম সেখানে অনেক বাড়িঘরে চিহ্ন দেওয়া ছিল যাতে সৈন্যরা সেইসব বাড়িতে হামলা চালিয়ে লোকজনকে হত্যা করতে পারে। এসব বাড়ি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের অথবা হিন্দুদের। আমার দেখা প্রতিটি শহরে প্রতিটি গ্রামে ছিল বধ্যভূমি। এসব স্থানে চেনা কিছু মানুষকে জড়ো করে গুলি করা হতো অথবা সবাইকে এক আঘাতে হত্যা করা হতো। একটা কায়দা ছিল, লোকজনকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে মাথায় গুলি করা যাতে এক বুলেটে পাঁচ-ছয়জনকে হত্যা করা যায়। ব্যাপারটা ছিল একরকমভাবে সংগঠিত।'

১৯৭১ সালের ১৪ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসে 'পশ্চিম পাকিস্তানিরা এখনো বাঙালিদের পদানত রাখতে চায়' শিরোনামে সিডনি শ্যনবার্গ লেখেন, 'গণহত্যার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংসসাধনও করছে সেনাবাহিনী।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা

ওইসব হামলার সময় ঘাতকেরা যে ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা অবশ্য সিদ্দিক সালিকের বইয়ে নেই। তবে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে এখনো এমন অনেক প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন যাদের কাছ থেকে পাকবাহিনী ও রাজাকার, আল-বদরদের নৃশংসতার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইদানিং বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ওইসব মর্মন্তুদ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য প্রচারও করা হচ্ছে। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার সময় যে-ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালায় এবং বড় বড় গর্ত করে তাতে সব লাশ ফেলে মাটিচাপা দেয় সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে আছেন সুরেশ দাস, তপন বর্ধন, হরিধন দাস, রাধানাথ ভৌমিক, শেখর কুমার চন্দ্র, দেবী নারায়ণ রুদ্রপাল, বাদলকান্তি দাস, বেনেডিক্ট ডায়াস, যশোদা জীবন সাহা, রানু রায় (দে), অরুণ দে, চান্দ দেব রায়, মোহন, শ্যামলাল, কেশব চন্দ্র পাল, রেনু বালা দে, রাজকুমারী দেবী (বিন্দুর মা), চিৎবল্লী, ইদু মিয়া, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে, ড. অজয় রায়, আব্দুল বারী, মাহমুদ হাসান, গোপাল চন্দ্র দে, বনজ কুমার

চক্রবর্তী, পরিমল গুহ, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বসাক, শ্রী বাসন্তী রানী গুহঠাকুরতা, বেগম রোকেয়া সুলতানা, গোপাল কৃষ্ণনাথ, কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ। এরা সবাই ওই গণহত্যার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির কাছে। এছাড়া সাক্ষ্য দেন প্রয়াত ড. রবীন্দ নাথ ঘোষ ঠাকুর, প্রয়াত ড. নূরুল উল্লা ও প্রয়াত কালী রঞ্জন শীল। এ কমিটি কয়েক বছর ধরে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অসংখ্য নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এর মধ্য থেকে বাছাই করা পাঁচ শতাধিক সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্তেষণ' এবং 'যুদ্ধ ও নারী' নামে দুটি প্রামাণ্যগ্রন্থ। ২৬৭টি সাক্ষাতকারে নারী নির্যাতনের জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রায় সব সাক্ষাতকারদাতাই একাত্তরে পাকবাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এর ভিত্তিতে অপরাধী হিসেবে ৩৩১ জন পাকিস্তানি সৈন্যের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে 'যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ' গ্রন্থে। এছাড়া ৬৩ জন পাকিস্তানি সৈন্যের আরেকটি তালিকা ঠাঁই পেয়েছে 'যুদ্ধ ও নারী' গ্রন্থে, যাদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

২৫ মার্চ রাতের হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) ২০০ জন, জগন্নাথ হলে তিনজন শিক্ষকসহ ৪১ জন, শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টারে ৪৫ জন, রমনা কালীবাড়িতে ৬০ জনসহ শাঁখারীবাজার ও শাঁখারীপট্টিসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, জিঞ্জিরা, নারায়ণগঞ্জ, মিরপুর, টঙ্গী ও জয়দেবপুরে কয়েক হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়। ওই রাতে ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট পিলখানায় ইপিআর সদর দফতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ হাজার ইপিআর সদস্যের ওপর। ৫৭ বিগ্রেডের ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজারবাগে দুই হাজার পুলিশ সদস্যকে 'নির্মূল' করে পুলিশ লাইনটি দখল করার দায়িত্ব নেয়। ১৮ পাঞ্জাব নবাবপুর এলাকা ও পুরান ঢাকায় হামলা চালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িগুলোকে অস্ত্রাগার মনে করে হামলার টার্গেটে পরিণত করে। হতাহতের সংখ্যা উল্লেখ না করলেও ২৫ মার্চ রাতের সামরিক অভিযানের এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইয়েও।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের পর এর কারণ খতিয়ে দেখতে পাকিস্তান সরকারের গঠন করা হামুদুর রহমান তদন্ত কমিশনের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যরাও বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংসতার অনেক তথ্য দিয়েছে। লে. কর্নেল এস এম নাঈম স্বীকার করেছেন, 'সুইপিং অপারেশনের সময় আমরা বহু নিরীহ মানুষকে মেরেছি।' ব্রিগেডিয়ার শাহ

আবদুল কাশিম বলেছেন, 'সামরিক অভিযানের সময় সৈন্যরা ক্রোধ ও পতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছে।' ২৭-২৮ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে লে. কর্নেল মনসুরুল হক বলেন, 'একটি মাত্র ব্যক্তির আঙ্গুলের ইশারায় ১৭ জন বাঙালি অফিসারসহ ৯১৫ জনকে স্রেফ জবাই করে ফেলা হয়।'

ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান : সাইমন ড্রিংয়ের প্রতিবেদন

২৫ ও ২৬ মার্চের ঢাকায় পাকহানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলার চাক্ষুস বর্ণনা প্রথম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং। ৩০ মার্চ ১৯৭১ ডেইলি টেলিগ্রাফ 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামে প্রকাশ করে সাইমন ড্রিংয়ের প্রথম প্রতিবেদনটি। এতে বলা হয়, 'আল্লাহ ও অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার নামে ঢাকা আজ ধ্বংস ও ভীতির নগরী। পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠাণ্ডা মাথায় টানা ২৪ ঘন্টা গোলাবর্ষণের পর ওই নগরীর ৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লড়াইকে নির্মমভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশটির সামরিক সরকারের প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদিও দাবি করছেন যে পরিস্থিতি এখন শান্ত তবু রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে গ্রামের দিকে পলায়নরত হাজার হাজার (tens of thousands) মানুষ। শহরের রাস্তাঘাট ফাঁকা এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে হত্যাযজ্ঞ চলছে। তবে সন্দেহ নেই যে ট্যাঙ্কের ছত্রছায়ায় সৈন্যরা শহর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লোকালয় নিয়ন্ত্রণ করছে।... সামান্যতম অজুহাতে লোকজনকে গুলি করে মারা হচ্ছে। নির্বিচারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়িঘর। ঠিক কতো নিরহী মানুষ এ পর্যন্ত জীবন দিয়েছে তার সঠিন হিসাব বের করা কঠিন। তবে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোরের হিসাব যোগ করলে এ সংখ্যা

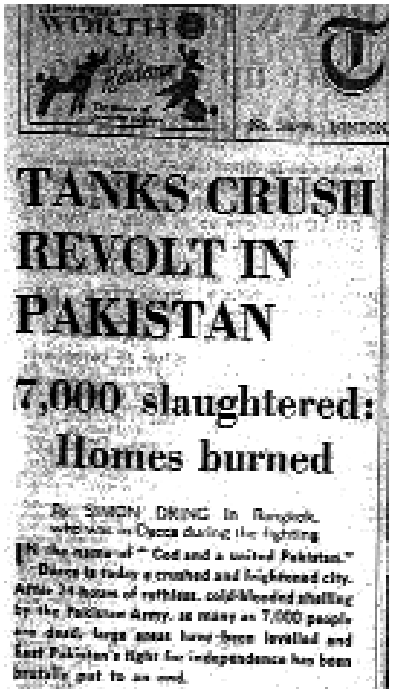

TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

7,000 slaughtered: Homes burned

By SIMON DRING in Bangkok, who was in Dacca during the fighting

"In the name of God and a united Pakistan."

Dacca is today a crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, cold-blooded shelling by the Pakistan Army, as many as 7,000 people are dead, large areas have been levelled and East Pakistan's fight for independence has been brutally put to an end.

১৫ হাজারে দাঁড়াবে। যা পরিমাপ করা যায় তা হলো সামরিক অভিযানে ভয়াবহতা। ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিছানায়, বাজারে কসাইদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের দোকানের পেছনে, নারী ও শিশুরা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, এক সঙ্গে জড়ো করে মারা হয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়িঘর, বাজার, দোকানপাট।' রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলার বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, 'একদিকে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হয় তখন শহরের অন্যদিকে আরেক দল সৈন্য আক্রমণ করে রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতর। প্রথমে ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়। পরে সৈন্যরা ঢুকে পুলিশের ব্যারাকগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, ওইসব ব্যারাকে তখন পুলিশ সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিল। এ হামলায় ঠিক কতজন নিহত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব যদিও জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হয়, ওই সময় সেখানে অবস্থানকারী ১১০০ পুলিশের মধ্যে অল্প ক'জনই রেহাই পেয়েছিল।'

এটা যথার্থই রক্তস্নান : টাইম ম্যাগাজিনে এক পশ্চিমা কর্মকর্তার মত

১২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে 'টাইম' ম্যাগাজিনে 'পাকিস্তান: পশ্চিমের প্রতি রাউন্ড-১' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়: গত সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে এক বিদেশী কূটনীতিক বলেন, 'সন্দেহ নেই যে এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গণহত্যা শব্দটিই প্রযোজ্য।' আরেকজন পশ্চিমা কর্মকর্তা বলেছেন, 'এটা যথার্থই রক্তস্নান। সৈন্যরা চরম নির্দয়।' লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'অবজারভার' পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে 'দ্য ফেডিং ড্রিম অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের বর্ণনা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনটি তৈরি করেন ব্রিটিশ সাংবাদিক কলিন স্মিথ। বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে দেওয়ার পর তিনি লুকিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন একজন গাইডের সহায়তায়। কলিন স্মিথের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আমরা নতুন শহরের কেন্দে গিয়ে পৌঁছে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে কেবল মেশিনগান তাক করা অবস্থায় সৈন্যদেরই দেখতে পাই। আর হিন্দু অধ্যুষিত মহল্লাগুলোতে গিয়ে দেখি সারি সারি ফাঁকা বাড়ি, সেখানে মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে।... এখন অবশ্য রাজধানীতে যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা রাতের আঁধারে খুন, লুট ও ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি ঢুকতে শুরু করেছে।' 'নিউজ উইক' সাময়িকী ২৬ এপ্রিল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে 'পাকিস্তান : শকুন আর পাগলা কুকুরের ভাগাড়' শিরোনামে। এতে বলা হয়, "শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো থেকে বেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় এক ডজনেরও বেশি হামলা চালায় পাঞ্জাবী সৈন্যরা।... এ হামলাগুলোর সময়

ব্যাপক নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। খবর পাওয়া গেছে, বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি বন্দিদের ট্রাকের ওপর দাঁড় করিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে বাধ্য করে। এই শ্লোগান শুনে আড়াল থেকে অন্য বাঙালিরা বেরিয়ে এলেই মেশিনগানের গুলিতে ধরাশায়ী করা হয় তাদের। সিলেট ও কুমিল্লায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থকদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা। পরে অসংখ্য বাঙালির লাশ শকুন আর কুকুরের ভোগের জন্য রাস্তায় ফেলে রাখা হয়।... ইসলামাবাদে হাইকমান্ড থেকে পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী এ দেশের ছাত্র, প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং নেতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময় অন্যদের পরিকল্পিত বা সুচারুভাবে (systematically) হত্যা করে সৈন্যরা।"

গণহত্যা : পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন (সানডে টাইমস)

'সানডে টাইমস' পত্রিকায় ১৩ জুন ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত হয় অ্যান্টনি মাসকারেনহাসের 'গণহত্যা : পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।' তাতে বলা হয়, 'বর্তমানেও গণহত্যা চলছে, আর তা সুপরিকল্পিতভাবে চালাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী। পূর্ব বাংলার সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ হিন্দুই কেবল এ সংঘবদ্ধ নির্যাতনের শিকার নয়, বরং হাজার হাজার বাঙালি মুসলমানও

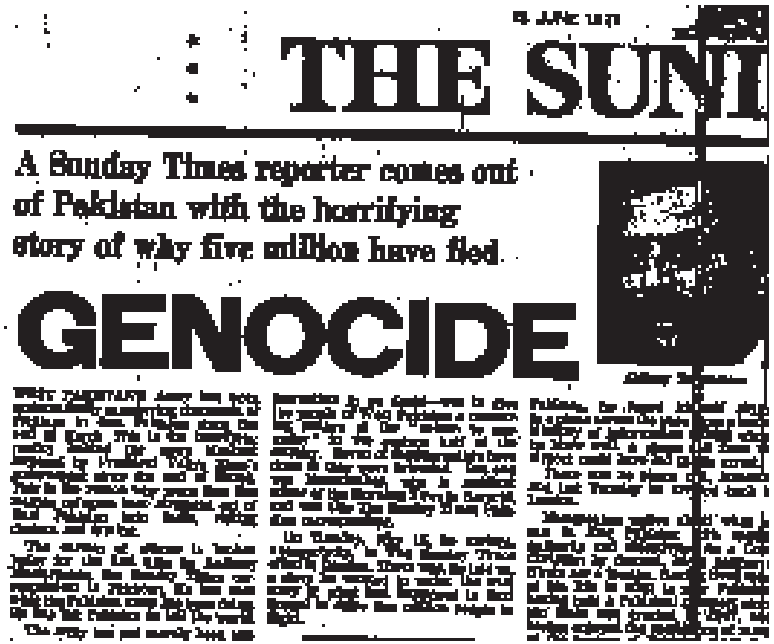
THE SUNI

A Sunday Times reporter comes out of Pakistan with the horrifying story of why five million have fled.

GENOCIDE

নির্যাতিত। এদের মধ্যে আছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্যাডাররা। রয়েছে ২৬ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে অভূতপূর্ব, তবে অসময়োচিত ও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করা বিদ্রোহে শামিল ১ লাখ ৭৬ হাজার বাঙালি সেনা ও পুলিশের সেইসব সদস্য যাদেরকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরতে পেরেছিল।' ঢাকা ও কুমিল্লায় সিনিয়র সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা অ্যান্টনি মাসকারেনহাসকে বারবার বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্নতার হুমকি থেকে মুক্ত করতে আমরা নির্মূল (cleanse) অভিযান চালাতে বদ্ধ পরিকর। এর জন্য প্রয়োজনে ২০ লাখ লোককে হত্যা এবং প্রদেশটিকে ৩০ বছর ধরে উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতেও পিছপা হবো না।'

শখানেক মাইলাই ও লিডিস : নিউজ উইক

নিউজ উইকে ২৮ জুন ১৯৭১ সংখ্যায় 'দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান' শীর্ষক আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।' নিউজ উইকের সাংবাদিক টনি ক্লিফটন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবিরগুলো ঘুরে তার রিপোর্টে মন্তব্য করেন, "পূর্ব পাকিস্তানে শখানেক 'মাইলাই' ও 'লিডিস' আছে—এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এ রকম স্থানের সংখ্যা আরো বহু বাড়বে।"

মাইলাই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। মার্কিন সৈন্যরা দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলের ছোট্ট গ্রাম মাইলাইয়ে ঢুকে নিরস্ত্র গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে নারী-শিশুসহ ৩৪৭ জনকে হত্যা করেছিল। আর চেক প্রজাতন্ত্রের লিডিস গ্রামে এক বেলায় ১৭৩ জন যুবককে হত্যা করেছিল জার্মান সৈন্যরা ১৯৪২ সালের ১০ জুন। আরো কয়েকশ নারী ও ১০০ শিশুকে ধরে নিয়ে পাঠানো হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। তাদের বেশিরভাগকেও পরে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংবাদ সংগ্রহের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও প্রথম তিন মাসেই এখানে মাইলাই ও লিডিসের মতো শখানেক বড় গণহত্যার তথ্য জানতে পারেন নিউজ উইকের সাংবাদিক। এ থেকেই বোঝা যায় ৯ মাসে বাংলাদেশের কী অবস্থা করেছিল হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসররা।

বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয় : পাকিস্তানি জেনারেলের স্বীকারোক্তি

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অসবরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তাজাম্মল হোসেন মালিক একাত্তরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ছিলেন ওই বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ২০৫ ব্রিগেডের কমান্ডার। ২০০১ সালের আগস্টে পাকিস্তান ডিফেন্স জার্নালে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অন্য অনেক অফিসারের কাছ থেকে আমি

জানতে পারি যে শুরুর দিকে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সান্তাহারে আমার একটি ডিফেন্সিভ পজিশনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয় (Large numbers of people were massacred)। জেনারেল টিক্কা খান ও ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব পূর্ব পাকিস্তানের কসাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরো অনেক ব্রিগেডিয়ার এবং জেনারেলও এমন কুখ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীও অনেককে হত্যা করে, তবে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর চালানো পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার তুলনায় তা ছিল খুবই তুচ্ছ।'

পাঁচ হাজার বধ্যভূমির সন্ধান

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে গঠিত বধ্যভূমি চিহ্নিত ও রক্ষা কমিটি সারাদেশে ৫ হাজার বধ্যভূমির সন্ধান পায়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটির সদস্য ছিলেন লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির। সম্প্রতি তিনি সাংবাদিকদের জানান, কমিটি সারাদেশে ৩ থেকে ৫ হাজার বধ্যভূমির সন্ধান পায়। তবে এ সবের মধ্যে ৫০০টির মতো বধ্যভূমি চিহ্নিত করা হয়। কিছু বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলো নদীভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। আবার কিছু বধ্যভূমির ওপর বাড়ি বা অন্য স্থাপনা নির্মিত হওয়ায় বধ্যভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করছেন না সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিকরা। শাহরিয়ার কবিরের মতে, এসব বধ্যভূমির হিসাব বাদ দিলেও দেশে কমপক্ষে তিন হাজার বধ্যভূমির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে প্রায় একই রকম তথ্য দিয়েছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটিও। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বধ্যভূমি চিহ্নিত ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে এ কমিটি। এ পর্যন্ত কমিটি সারাদেশে ৯২০টি বধ্যভূমি চিহ্নিত করতে পেরেছে। এর মধ্যে শুধু ঢাকায়ই রয়েছে ৭০টি। ঢাকার মিরপুর এলাকায় আছে ২৩টি বধ্যভূমি। দেশের ৮৮টি নদী এবং ৬৬টি ব্রিজ বা কালভার্টও ছিল ঘাতকদের বাঙালি নিধনের চিহ্নিত স্থান। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার খোলা মাঠ অথবা খালগুলো বাঙালি বধের স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিটি স্থানে কমপক্ষে ৬ থেকে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শতাধিক মানুষকে হত্যা করার তথ্য কমিটির অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে। এ হিসাবে বধ্যভূমিগুলোতে ৫ লাখ মানুষের হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কমিটির মতে, দেশে প্রায় ৫ হাজার বধ্যভূমিতে নিহত মানুষের সংখ্যা হতে পারে ১৮ লাখ। এসব বধ্যভূমি থেকে কমিটি মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষের দেহাবশেষ খুঁজে পাচ্ছে। বাকি ৭০ শতাংশ দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব হয়তো কোনো খালে পড়ে রয়েছে অথবা নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেছে। ঢাকার মুসলিম বাজার বধ্যভূমির ওপর

একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। গণহত্যার শিকার অধিকাংশ ব্যক্তির দেহাবশেষ যে-স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানেই তৈরি করা হয়েছে মসজিদের শৌচাগার। সেখানে আরো অনেকের দেহাবশেষ এবং মুক্তিবাহিনীর ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। একইভাবে মিরপুর বাংলা কলেজের পেছনের আম বাগানের বধ্যভূমির অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়েছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের পর সেখান থেকে কয়েক ট্রাক মানুষের দেহাবশেষ অপসারণ করা হয়েছিল। মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে বধ্যভূমি দখল করে এক ব্যক্তি কবরস্থান ও মার্কেট তৈরি করেছে। অথচ শিয়ালবাড়ির ওই বধ্যভূমিটি ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক গণহত্যার সাক্ষী। কালাপানি এলাকায় বধ্যভূমির জমি সাগুফতা হাউজিং নামে এক আবাসন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ডা. এমএ হাসান ২০০২ সালে এক লেখায় উল্লেখ করেন, 'একাত্তরের গণহত্যাযজ্ঞ যে কতটা ব্যাপক, ভয়ঙ্কর ও পরিকল্পিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে কয়েকটি গণহত্যা স্পটের পরিসংখ্যান দেখলেই। বাড়িয়া গণহত্যায় একই দিনে পাকি আর্মিরা হত্যা করে ২০০ নিরীহ গ্রামবাসীকে, যাদের মধ্যে ৪৫ জন ছিলেন নারী। একইভাবে তারা ছাব্বিশাতে ৪০ জনকে হত্যা করে, যার মধ্যে ৭ জন ছিলেন নারী। গোলাহাটে ৪১৩ জনকে হত্যা করে, যার মধ্যে যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ১০০। বানিয়াচং থানার জিলুয়া-মাকালকান্দিতে ১০০ জনকে হত্যা করে, যাদের মধ্যে ২৬ জন নারী ছিলেন। কোদালিয়ায় তারা কেবল ১৮ জন মহিলাকে হত্যা করে। কড়াই কাদিপুরে ৩৬১ জনকে হত্যা করে, যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল ৬০। হাতিয়া-দাগারকুটিতে ৩০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, যার মধ্যে নারী ছিল ৪০ জন। কেতনারকোলা-রাংতায় পাকি আর্মিদের গণহত্যার শিকার গ্রামবাসীদের চারটি গণকবরে যথাক্রমে ৩০, ৪০, ৬০ ও ৮৫ জন করে কবরস্থ করা হয়, যার মধ্যে অধিকাংশ লাশই ছিল মহিলাদের। উল্লেখ্য, এইসব মহিলাকে হত্যা করার পূর্বে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয়।'

ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির গবেষণায় যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তাতে দেখা যায়, একাত্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হন ৪ লাখ ৬৮ হাজার বাঙালি নারী। সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞ ড. জিওফ্রে ডেভিসের পৃথক গবেষণায়ও নারী নির্যাতন সম্পর্কে একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঙালি নারী ধর্ষণ-নির্যাতনের যে অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি তার একটি ঘটনা এ রকম : 'চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে বসবাসকারী শহীদ আকবর হোসেনের পুত্র রাউফুল হোসেন সুজা সে সময় পিতার লাশ খোঁজার জন্য বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে ফয়'স লেকের বধ্যভূমিতে যান। সেখানে তারা প্রায় ১০ হাজার বাঙালি নরনারীর লাশ

দেখতে পান, যাদের অধিকাংশকেই জবাই করা হয়েছিল। বাবার লাশ খুঁজতে গিয়ে তারা সেখানে ৮৪ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার লাশও দেখতে পান, যাদের সবার পেট ফেঁড়ে দেওয়া ছিল।'

একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর জঘন্য অপরাধের আরেকটি হলো বুদ্ধিজীবী হত্যা। জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ গোপন হত্যা, গুম করা ও সব ধরনের নির্যাতনের হোতা। বুদ্ধিজীবীদের বাসা থেকে ধরে আনার জন্য রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের গাড়ি সরবরাহ করতে তিনি ক্যাপ্টেন তাহেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাও ফরমান আলী সম্পর্কে রবার্ট পেইন লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইনি ছিলেন টিক্কা খানের ডান হাত। ... ঢাকায় সঙ্কটকালে তার প্রথম কাজ ছিল ইয়াহিয়া খানের অনুগত ধর্মান্ধ মানুষ নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করা। তিনি তা করেছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুগত ছাত্রদের নিয়ে তিনি এই বাহিনী তৈরি করেন, যার নাম ছিল আল-বদর। ...এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের গোপনে হত্যার চক্রান্ত করে। শুধু গোপন চক্রান্তই নয়, আল-বদররা এসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল লোকচক্ষুর আড়ালে।' রবার্ট পেইন আরো জানান, "পুরো নয়টি মাস ঢাকায় যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার হোতা ছিলেন তিনিই (ফরমান আলী)। ...২৫ মার্চের রাতে তিনি বলেছিলেন, 'বাঙালিদের আমি ৪০ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ফেলবো।' সেই রাতে তার সামনে ছিল ঢাকার একটি বিশাল ম্যাপ, পাশে একগুচ্ছ টেলিফোন। তার আদেশ প্রচার করার জন্য সামনে ছিল একটি টেপ রেকর্ডারও। তার নির্দেশগুলো তিনি ইংরেজিতেই দিয়েছিলেন। সেই টেপ পরে পাওয়া গিয়েছিল। তাতে শোনা গেছে তার নরম অথচ দৃঢ় গলায় দেওয়া আদেশগুলো। এই আদেশের পর সেই একই গলায় শোনা যায়, 'কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না; মনে করবে কিছুই হয়নি। তোমাদেরকে কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আবারো বলছি, চমৎকার কাজ করছো তোমরা'।"

এ জঘন্য গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের হোতাদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল লিয়াজি, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, এসজিএম পীরজাদা, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা, বিগ্রেডিয়ার জাহানজেব আরবাব প্রমুখ। এসব উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার পরিকল্পনা ও নির্দেশে অধস্তন অন্য অফিসার ও সৈন্যরা একাত্তরের নয় মাস বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

বিচারের তাগিদ জাতিসংঘের

বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের এক প্রস্তাবে। ১৯৭৩ সালের মার্চে জেনেভায় কমিশনের ২৯তম অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয়, 'যে হাজার হাজার বাঙালি নির্যাতন কক্ষে যন্ত্রণা ভোগ

করেছে, নির্যাতনের যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের লাখ লাখ বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তান এবং যারা বেঁচে গেছে তাদের এটা আশা করার অধিকার রয়েছে যে, যারা এসব ঘৃন্য অপরাধের জন্য দায়ী তারা যেন বিচার থেকে রেহাই না পায়।' প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'যেসব লোক গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ, সুপরিকল্পিত হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগসহ মারাত্মক অপরাধ করেছে বলে প্রমাণ আছে তাদের বিচার করার অধিকার ও কর্তব্য বাংলাদেশের রয়েছে।'

পাকিস্তানি বিশিষ্টজনদের দাবি : বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত

একাত্তরে গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী সব ধরনের অপরাধের জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে পাকিস্তান সরকারের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেট তারকা (বর্তমানে রাজনীতিক) ইমরান খান। ২০১১ সালের ২৩ মার্চ দুপুরে জিয়ো নিউজ ও জিয়ো সুপার টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত টক শোতে ইমরান খান এ দাবি তোলেন। জিয়ো টিভির টক শোতে ইমরান খানের সাক্ষাৎকার নেন চ্যানেলটির নির্বাহী সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক হামিদ মির। ঢাকায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগে ইমরানের কাছে হামিদের প্রশ্ন ছিল, মিরপুরে বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে তিনি কী আচরণ আশা করেন। ইমরানের উত্তর ছিল: পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সমর্থন জানাবে বাংলাদেশ। হামিদ তখন বলেন, আজ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস। এ দিনে আপনার প্রত্যাশা, বাংলাদেশের দর্শক পাকিস্তান দলকে সমর্থন জানাবে। আপনার কি মনে হয় না, একাত্তরে সামরিক অভিযানের জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়ার সময় এসেছে? এ বিষয়ে হামিদ মিরকে সমর্থন জানান ইমরান খান। তিনি বলেন, অতীতে তাঁর মত ছিল, সামরিক অভিযান ভালো পন্থা। কারণ একাত্তরে কোনো নিরপেক্ষ গণমাধ্যম ছিল না। ১৯৭১ সালে তাঁর লন্ডনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে ইমরান আরও বলেন, 'সে সময় আসলে কী ঘটেছিল, তার নির্মম রূপটা বাংলাদেশি বন্ধুদের কাছ থেকেই জেনেছিলাম।'

১৯৯৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি 'দ্য নিউজ' পত্রিকায় এক নিবন্ধে ড. তারিক রহমান লিখেছেন, 'গত কয়েক বছর যাবৎ আমি বলে আসছি যে, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে যাদের হত্যা করা হয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্রোহী বলে যাদের পাকড়াও করা হয়েছে এবং যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তাদের জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে পাকিস্তান সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।' জনমতের চাপেই হয়তো বা ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলেছিলেন, ১৯৭১-এর ট্র্যাজেডির জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। পরে ২০০২ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ একাত্তরের ঘটনাবলির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পরিদর্শক বইতে তিনি লেখেন, 'পাকিস্তানে আপনাদের ভাই-

বোনেরাও একাত্তরের ঘটনাবলির জন্য আপনাদেরই মতো বেদনা বোধ করে। সেই দুর্ভাগ্যজনক সময়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা দুঃখজনক।' মোশাররফের ওই দুঃখ প্রকাশকে তখন স্বাগত জানায় পাকিস্তানের ৫০টি বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠন। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলে, 'বাংলাদেশ সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ক্ষ পারভেজ মোশাররফ ১৯৭১-এর নৃশংসতার জন্য যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই সুযোগে ওই সময়কার সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও নিষ্ঠুরতার জন্য বাংলাদেশের ভাই-বোনদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব ঘটনা ওই সময় ঘটেছিল সেজন্য আমরা দুঃখিত।' (সূত্র : জনকণ্ঠ, ৩ আগস্ট ২০০২)। বিবৃতিদাতা সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিউম্যান রাইটস কমিশন অব পাকিস্তান, অ্যাকশন এইড পাকিস্তান, ল'ইয়ারস ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগ্যাল এইড, দামান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি ইনস্টিটিউট, স্টেনদেনিং পারটিসিপেটরি অরগানাইজেশন, সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ পাকিস্তান, ডেমোক্র্যাটিক কমিশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইন্টার প্রেস কমিউনিকেশন, জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর পিপলস রাইটস, ওয়ার্কিং উইমেন

অর্গানাইজেশন প্রভৃতি।

২০০৭ সালের মে মাসে ইসলামাবাদে জং গ্রুপ অব নিউজপেপারস আয়োজিত এক মিডিয়া সেমিনারে পাকিস্তানের সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান মুশাহিদ হোসেন সৈয়দ বলেন, একাত্তর ও তার আগে-পরে বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, একাত্তরে যা ঘটেছিল তা নিয়ে লুকানোর কিছু নেই। ওই সময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যা করেছে তাকে ভুল না বলে অপরাধ বলাটাই সমীচীন হবে। (সূত্র : দ্য নিউজ অনলাইন, ১৫ মে ২০০৭)।

এর আগে ২০০০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে 'অতীত ভুলে যাওয়ার' পরামর্শ দিলে তার কঠোর সমালোচনা করেন পাকিস্তানি কলামিস্ট ইরফান হাসান। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে 'ডন' পত্রিকায় এক নিবন্ধে তিনি বলেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ভুলে যাওয়া বা ক্ষমা করা যায় না। ইরাফান হাসান আরো বলেন, একাত্তরে বাংলাদেশে গণহত্যা ও বিপুল সংখ্যক নারী ধর্ষণের খবরকে আর দশজন পাকিস্তানির মতো তিনিও ভারতীয় ও পশ্চিমাদের অপপ্রচার বলেই মনে করতেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তার অনেক সাবেক সহকর্মী 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলে তাদের কাছ থেকে নিশ্চিত হন যে, সত্যি তখন বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল।

২০০৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর ইসলামবাদ প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে জিয়ো টেলিভিশন চ্যানেলের নির্বাহী সম্পাদক হামিদ মীর একাত্তরের পাকবাহিনীর গণহত্যার ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণের কাছে দুঃখ প্রকাশের প্রস্তাব পেশ করলে তা গৃহীত হয়। পরে 'Dear Bangladeshis Sorry for 71 Genocide' লেখা একটি ব্যানারও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, আইনজীবী, ছাত্র ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজাকার, নব্য-রাজাকারদের বৃথা আস্ফালন

যেখানে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাই গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন এবং সে দেশের সংবাদ মাধ্যমে (ডেইলি টাইমস, ৫ অক্টোবর ২০১১) ওই গণহত্যায় জামায়াতে ইসলামীর সম্পৃক্ততার তথ্য দেওয়া হচ্ছে, সেখানে স্থানীয় দালাল-রাজাকারদের এ অপরাধ আড়াল করার চেষ্টা বৃথা আস্ফালন নয় কি! অথচ রাজাকার, নব্য-রাজাকাররা জোর গলায় দাবি করছে, বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধী ছিল না, বর্তমানেও নেই। এদের কেউ কেউ এমনও বলে যে, একাত্তরে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি, ওটা ছিল গৃহযুদ্ধ। আর ওই যুদ্ধে গণহত্যার ঘটনাও ঘটেনি। যা ঘটেছে তা হলো দু'পক্ষের মধ্যে

খুনোখুনি। অথচ সারা বিশ্ব জানে, একাত্তরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। সত্তরের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের ২৬ মার্চ (২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চ রাত ১২টার পর বেতারে শোনা গিয়েছিল সেই ঘোষণা। ওই ঘোষণার খবর ২৭ মার্চ বেশির ভাগ বিদেশি পত্রিকায় ছাপা হয়। ওই দিন লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্য টাইমসের প্রধান শিরোনামই ছিল 'হেভি ফাইটিং অ্যাজ শেখ মুজিবুর ডিক্লেয়ারস ই. পাকিস্তান ইনডিপেনডেন্ট।' ২৬ মার্চ মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টেও বলা হয়, ''পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বাঞ্চলকে 'সার্বভৌম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।'' ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। সে বছরের ১৭ এপ্রিল যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানেও এসব তথ্য রয়েছে। কাজেই যারা সেদিন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী। আর এ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যই ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩' পাস করা হয়। সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর আলোকে এটি করা হয়েছিল। ওই সংশোধনী কখনো বাতিল করা হয়নি।

ঘাতক রাজাকার আল-বদর ও নব্য-রাজাকাররা যত আস্ফালনই করুক না কেন, দিন তাদের ফুরিয়ে আসছে। যতই দিন যাচ্ছে খোদ পাকিস্তানেই একাত্তরের গণহত্যা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে। সাংবাদিক, অধ্যাপক, লেখক ও মানবাধিকার কর্মীরা একাত্তরের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলছেন ক্রমাগত। এ দাবি যারা জানিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মানবাধিকার নেত্রী আসমা জাহাঙ্গীর, ইসলামাবাদের কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারিক রহমান, প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট জেড এ সুলেরি, লেখক শেহজাদ আমজাদ, ইরফান হাসান, সাংবাদিক হামিদ মীর প্রমুখ।

DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION
DI-2
DIA SPOT REPORT

DATE: 26 March 1971
TIME: 1430 EST

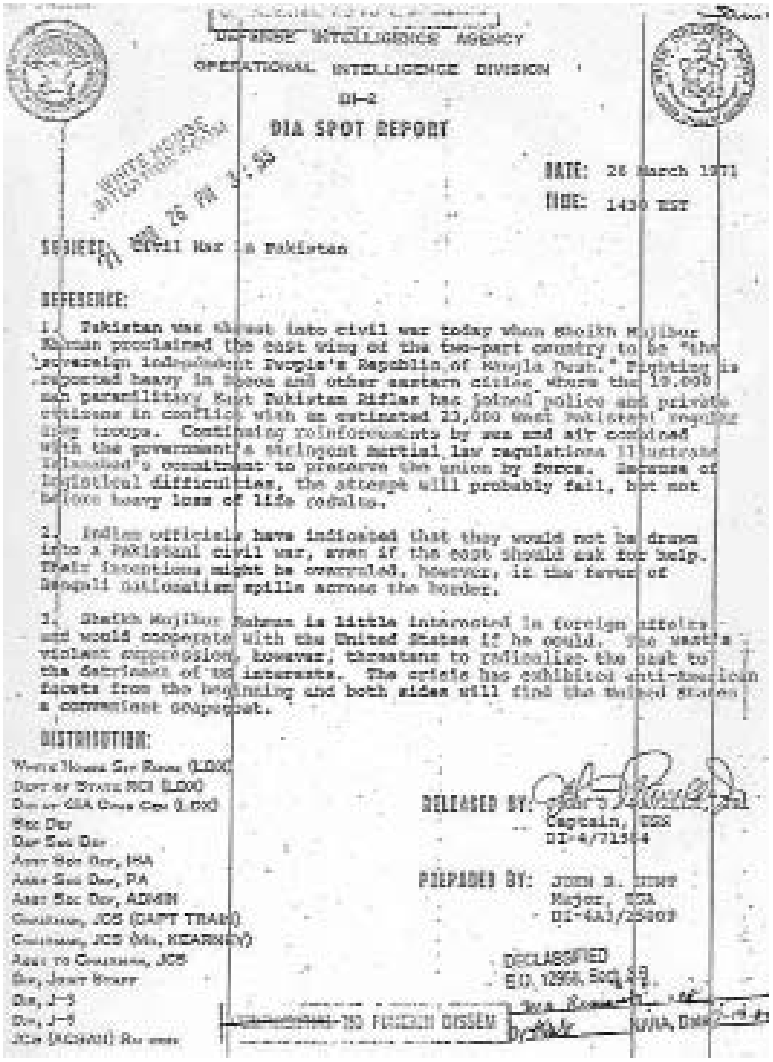

SUBJECT: Civil War in Pakistan

REFERENCE:

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent People's Republic of Bangla Desh." Fighting is reported heavy in Dacca and other eastern cities where the 13,000 man paramilitary East Pakistan Rifles has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringent martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life ensues.

2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fervor of Bengali nationalism spills across the border.

3. Sheikh Mujibur Rahman is little interested in foreign affairs and would cooperate with the United States if he could. The west's violent suppression, however, threatens to radicalize the east to the detriment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the beginning and both sides will find the United States a convenient scapegoat.

DISTRIBUTION:
White House Sit Room (LDX)
Dept of State RCI (LDX)
Dir of CIA Ops Cen (LDX)
Sec Def
Dep Sec Def
Asst Sec Def, ISA
Asst Sec Def, PA
Asst Sec Def, ADMIN
Chairman, JCS (CAPT TRAIN)
Chairman, JCS (Mr. KEARNEY)
Asst to Chairman, JCS
Dir, Joint Staff
Dir, J-3
Dir, J-5
JCS (ADMIN) Ro

RELEASED BY: Captain, USN DI-4/71364

PREPARED BY: JOHN B. Major, USA DI-4A3/25909

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sec. 3.6

NO FOREIGN DISSEM

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টে আগের রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও পাকিস্তানিদের যুদ্ধ শুরুর তথ্য

প্রধান ঘাতক-সহযোগী দল জামায়াত অপরাধ চাপা দেওয়ার সুযোগ নেই

একাত্তরের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায় পাকহানাদার বাহিনীর অন্যতম দোসর জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতাদের ওপরও বর্তায়। তারা সেদিন শুধু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কার্যক্রমকে সমর্থনই দেয়নি, বরং রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস নামে বিভিন্ন সশস্ত্র ঘাতক বাহিনী তৈরি করে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বাঙালি নারীদের 'গনিমতের মাল' আখ্যা দিয়ে তাদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে সৈন্যদের হাতে। বুদ্ধিজীবী হত্যায় আল-বদরদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। তাদের এসব অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায় জামায়াতে ইসলামীরই মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামের ওই সময়কার বিভিন্ন প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে। প্রমাণ আছে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির গোলাম আযমের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনে যা দেখলাম'-এ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তখনকার জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের লেখা 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থেও জামায়াত, মুসলিম লীগ ও জামায়াতের সৃষ্ট বিভিন্ন বাহিনীর অপকর্মের বর্ণনা আছে। প্রমাণ আছে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা প্রতিবেদন, যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিল এবং বিদেশি পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনেও।

২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী জেনেভা কনভেনশন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ১০ দিনের মধ্যে ৪ এপ্রিল নূরুল আমিন, গোলাম আযম, ফরিদ আহমদ, খাজা খয়ের উদ্দিন প্রমুখ নেতা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সেই বৈঠকের ছবিও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরই তারা সারা দেশে গড়ে তোলেন শান্তি কমিটি, যাদের মূল কাজই ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করা। রাজাকার বাহিনীতে লোক রিক্রুট, তাদের প্রশিক্ষণশেষে শপথ পড়ানো এবং বাঙালিদের ধন-সম্পদ লুট করে তা ভাগবাটোয়ারার কাজটিও করত এরা। এ বিষয়ে সিদ্দিক সালিক তার বইয়ে

লিখেছেন 'পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা সন্দেহজনক লোকদের চেহারা যেমন চিনত না তেমনি অলিগলির নম্বরও (বাংলায় লেখা) পড়তে পারত না। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতার ওপর তাদের নির্ভর করতে হতো। ব্যাপক হারে বাঙালিরা তখনো আশান্বিত ছিল যে, মুজিব ফিরে আসছেন। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় উদাসীন মনোভাব ধরে রাখত। এ সময় যারা এগিয়ে আসেন তারা ছিলেন দক্ষিণপন্থী। যেমন—কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন, কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাইয়ুম মুসলিম লীগের খান এ সবুর খান, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও নেজামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরিদ আহমদ। এদের সবাইকে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত করে। বাঙালিদের ওপর এদের প্রভাবও ছিল সামান্য। সাধারণ মানুষের অনুভূতি ছিল—এরা সবাই অচল মুদ্রা।' এরকম একজন দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকের দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক ও বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে একদিন রাতভর গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানী সৈন্যরা কীভাবে ঢাকার পাশে কেরানীগঞ্জকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করেছিল সে বর্ণনাও আছে বইটিতে। ওই আক্রমণ পরিচালনাকারী সেনাকর্মকর্তা 'দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে' সিদ্দিক সালিককে বলেছিলেন, 'ওখানে কোনো বিদ্রোহী ছিল না। ছিল না অস্ত্রও। শুধু গ্রামের গরিব লোকেরা—অধিকাংশ নারী ও বৃদ্ধ গোলার আগুনে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক এই যে, গোয়েন্দা মারফত সঠিক সংবাদ সংগ্রহ না করেই এ আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। আমার বিবেকের ওপর এ ভার আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বয়ে বেড়াবো।' নিজের নৃশংসতার কারণে একজন হানাদার সেনাকর্মকর্তা বিবেকের দংশনে ভুগলেও এসব নিয়ে কোনো বিকার বা অনুশোচনা নেই স্থানীয় রাজাকার আল-বদর তথা জামায়াতী এবং নিরপেক্ষতার ভেকধারী নব্য-রাজাকারদের। একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবি উঠলেই এসব তথাকথিত নিরপেক্ষ নব্য-রাজাকাররা জাতির ঐক্যের ধুয়া তুলে বিষয়টিকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্ট চালায়।

স্থানীয় দালালদের ওইরকম উদ্দেশ্যমূলক বানোয়াট খবর সরবরাহের কারণ সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'এদের কেউ কেউ অবশ্য আওয়ামী লীগপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের পুরনো ক্ষত মীমাংসার জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগকে ব্যবহার করত।'

'শান্তি কমিটি' ও 'রাজাকার বাহিনী' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অপারেশনের সময় কিছু সৈনিক লুট, হত্যা ও ধর্ষণের মতো লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হয়। ....এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনার কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই

আমাদের বাঙালি জনগণ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়। আগে থেকেই তারা আমাদের পছন্দ করত না। এখন তারা দারুনভাবে ঘৃণা করতে লাগল। এ ধারাকে রোধ করতে কিংবা ঘৃণা কমানোর জন্য কোনো প্রকৃত উদ্যোগ নেওয়া হলো না। অতএব, ব্যাপক সংখ্যক বাঙালির সহযোগিতা পাওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না। সেইসব ব্যক্তিই আমাদের হাতে হাত মেলালো—যারা ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে তাদের সবকিছুরই ঝুঁকি নিতে তৈরি ছিল। এ ব্যক্তিদের দুটি গ্রুপে সংগঠিত করা হয়। বয়স্ক ও নামকরা ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা হলো শান্তি কমিটি। আর যারা তরুণ ও কর্মক্ষম দেহের অধিকারী তাদেরকে রাজাকার (স্বেচ্ছাসেবক) বাহিনীতে রিক্রুট করা হলো।'

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। আর রাজাকার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন মে মাসে খুলনায় জামায়াত নেতা মওলানা একেএম ইউসুফ। জুন মাসে সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গেজেট নোটিফিকেশনের (নং-৪৮৫২/৫৪৩/পিএস-১ ক/৩৬৫৯/ডি-২ ক) মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে সরাসরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে শান্তি কমিটির নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রতিটি রাজাকার ব্যাচের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর শান্তি কমিটির স্থানীয় প্রধান তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এরপর রাজাকারদের কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করতেন শান্তি কমিটি প্রধান। একাত্তরের ২২ সেপ্টেম্বর মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) এক রিপোর্টে বলা হয়, 'বিহারি ও উগ্র হিন্দুবিদ্বেষী কিছু বাঙালিকে নিয়ে অফিসিয়ালি (সরকারিভাবে) গঠন করা হয় শান্তি কমিটি। এরা কিছু সরকারি দায়িত্বও পালন করে।' এর আগে সে বছরের ২৯ জুলাই ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জারের নের্তৃত্বাধীন সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের জন্য প্রণীত একটি পেপারে শান্তি কমিটিকে সামরিক শাসনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে একে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়। সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ওই সুপারিশ করেছিল মার্কিনীরা। ১৯৭১ সালের ২৩ জুলাই *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এ সাংবাদিক পিটার আর ক্যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী, শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের ওপর সেনাবাহিনীর আস্থার ঘাটতি থাকায় তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা দিয়ে গঠন করা হয় শান্তি কমিটি। অবাঙালি বিহারি এবং মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর মতো কিছু রক্ষণশীল ধর্মভিত্তিক ছোট রাজনৈতিক দলের লোকজনকে

নিয়ে এ কমিটি গঠন করে সেনাবাহিনী। সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীতে লোক রিক্রুট করার দায়িত্ব পালন করে এরা। শান্তি কমিটির সদস্যরা সেনাবাহিনীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এরা বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু ও স্বাধীনতাপন্থী বাঙালিদের বাড়িঘর, দোকানপাট ও জমিজমা দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়।' অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর সদস্য ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণহত্যার নীলনকশা তৈরি করে তা বাস্তবায়নও করেছে শান্তি কমিটির লোকেরা। একাত্তরের ২৩ জুন রাজশাহীর পবা থানার হুজুরীপাড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল কার্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে হামলা চালানো হয় শান্তি কমিটি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে। দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে তাদের ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। সে বছর *দৈনিক সংগ্রাম*-এ ১৫ জুলাই সাতক্ষীরা প্রতিনিধির পাঠানো এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শান্তি কমিটির সদস্যরা দুষ্কৃতিকারীদের আটক ও শায়েস্তা করতে তৎপর রয়েছে।' এ ছাড়া রাজাকারদের পরিচয়পত্র দিত শান্তি কমিটি। রাজাকারদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সেনাবাহনীর সব চিঠিপত্রের অনুলিপি দেওয়া হতো শান্তি কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। আর গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে শান্তি কমিটির একটি নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীও ছিল। এসব তথ্য ও দলিল থেকে প্রমাণ হয় যে শান্তি কমিটিও ছিল সশস্ত্রবাহিনীর সহযোগী বাহিনী। আর গোলাম আযম ছিলেন এই সহযোগী বাহিনীর নেতা। তার দল জামায়াতে ইসলামীকেও সশস্ত্রবাহিনীর সহযোগী বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়েছিল। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখের দৈনিক পাকিস্তান থেকে জানা যায়, গোলাম আযম বলেছিলেন, 'পাকিস্তান টিকিয়ে রাখতেই জামায়াতে ইসলামী শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।' এ ছাড়া গোলাম অযমের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরাই প্রথম খুলনায় রাজাকার বাহিনী গঠন করে (সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান/ আজাদ, ২৫-২৭ মে ১৯৭১)।

মে-জুন মাস জুড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজাকার বাহিনী গঠনের পর জামায়াত নেতাদের পাশাপাশি কেন্দীয় শান্তি কমিটি নেতাদের আবেদন-নিবেদন ও তদবিরেই টিক্কা খান আনসার বাহিনীর শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি করেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে আনসার বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই এ বাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। রাজাকার অর্ডিন্যান্স বলে ১৯৫৮ সালের আনসার অ্যাক্ট বাতিল ঘোষণা করে আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করা হয়। সেই সঙ্গে আনসার বাহিনীর সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মূলধন ও দায় এবং রেকর্ডপত্র হস্তান্তর করা হয় রাজাকার বাহিনীর কাছে। আনসার বাহিনীতে তখন পর্যন্ত থেকে যাওয়া অ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার অ্যাডজুট্যান্ট

নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পর জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা নেতাদের করা হয় নিজ নিজ জেলায় রাজাকার বাহিনীর প্রধান। ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ ইউনুসকে করা হয় এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল, ফকিরেরপুল, আরামবাগের রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন ফিরোজ মিয়া। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ফিরোজ ছিলেন ওই এলাকার ত্রাস।

একাত্তরে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদর বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়েছিল। এ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হয় ২২ এপ্রিল জামালপুরে পাকিস্তানী বাহিনীর পদার্পণের পরপর ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে। অন্যদিকে আল-শামস বাহিনীতে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাড়াও মুসলিম লীগপন্থী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার নেতা-কর্মীরা ছিল। আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল অনেকটা একই রকম। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে এদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

একাত্তরে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে গোলাম আযম তার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন, জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল (পৃ-১৪৪)। টিক্কাখানের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার আহ্বান জানিয়ে রেডিওতে ভাষণও দেন। বইয়ের ১৫০ পৃষ্ঠায় গোলাম আযম লিখেছেন, 'যে রেযাকাররা (রাজাকার) দেশকে নাশকতামূলক তৎপরতা থেকে রক্ষার জন্য জীবন দিচ্ছে তারা কি দেশকে ভালোবাসে না? তারা জন্মভূমির দুশমন হতে পারে?' মুক্তিযুদ্ধকে জামায়াতিরা তখন নাশকতামূলক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বলেই অপপ্রচার চালাতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী গঠনে প্রধান উদ্যোগটিও নিয়েছিলেন জামায়াত নেতা গোলাম আযম। যমদূত রাজাকার বাহিনী গঠনের

দৈনিক সংগ্রাম ২৮ ১১ ১৯৭১

দেশপ্রেমিক জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
—গোলাম আযম

প্রস্তাবটি তিনি দিয়েছিলেন ২০ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে। এর আগের দিন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার খবরে বলা হয়, গোলাম আযম লাহোরে বলেছেন, 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু সুপারিশ রাখবেন। তবে এগুলো আগেভাগে প্রকাশ করা ভাল হবে না।'

জামায়াতের ভূমিকা : দৈনিক সংগ্রামের পাতা থেকে

ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন অর্থাৎ ২১ জুন দৈনিক সংগ্রামের খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির 'দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলার জন্য দেশের আদর্শ ও সংহতিতে বিশ্বাসী লোকদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।' এর পরদিনই দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'দেশপ্রেমিকদের অস্ত্রসজ্জিত করা হলে অল্প সময়েই দুষ্কৃতকারীদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে।' পাকিস্তানিদের মতো জামায়াতীরাও তখন মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকদের দুষ্কৃতকারী বলতো। একাত্তরের ২৩ নভেম্বর লাহোরে গোলাম আযম সাংবাদিকদের বলেন, 'বর্তমান মুহূর্তে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করাই হবে দেশের জন্য আত্মরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।' পরদিন তাঁর এ বক্তব্য দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়। ২৭ নভেম্বর গোলাম আযম পিন্ডি আইনজীবী সমিতির এক সভায় বলেন, 'দেশপ্রেমিক জনগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।' এ খবরও প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামে।

আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে
—গোলাম আযম

সংগ্রাম

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা রাজাকার বাহিনীকে সামরিক বাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করার পরও জামায়াতীরা আরো বেশি সংখ্যক ও ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী যশোরে তার সংগঠনের এক সভায় বলেন,

সংগ্রাম ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

যশোরে রাজাকারদের মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য

অপরিণামদর্শী নেতারাই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী

(৮-এর পাতায় দেখুন)

'দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছি তেমনি সরকারের উচিত হবে আমাদের খাঁটি সৈনিকরূপে গড়ে তোলা।' (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)।

কুখ্যাত শান্তি কমিটি গঠনের প্রস্তাবটিও ছিল জামায়াতে ইসলামীর। এ প্রস্তাব তারা দিয়েছিল একাত্তরের ৬ এপ্রিল। এর পরদিনই জামায়াতের পত্রিকা সংগ্রামে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 'বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি গঠন এক্ষেত্রে (জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করা) খুবই সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের শান্তি কমিটি দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে শান্তিকামী নাগরিকদের জানমাল রক্ষা করতে পারবে।' শান্তি কমিটিতে জামায়াত ছাড়াও আরো কয়েকটি দলের নেতা-কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে রাজাকার বাহিনীর মতো ঘাতক বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়নি। দৈনিক সংগ্রামে ২৩ আগস্ট 'রেজাকার অর্ডিন্যান্স' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছাড়া কেউ যেন এ বাহিনীতে যোগ দিতে না পারে।' ওই সম্পাদকীয়তেই প্রথম জানানো হয়, 'দেশের কোথাও কোথাও রাজাকার বাহিনী বদরবাহিনী হিসেবে পরিচিত।'

১৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার বিষয়ে নিজামীর নির্দেশনার কথা প্রকাশিত হয়। খবরটি এ রকম—'যশোর জেলা রেজাকার সদর দফতরে সমবেত রেজাকারদের উদ্দেশে জাতির এই সংকটজনক মুহূর্তে প্রত্যেক রেজাকারকে ঈমানদারীর সাথে তাদের উপর অর্পিত এই জাতীয় কর্তব্যে সচেতন হওয়ার' আহ্বান জানিয়ে নিজামী বলেন, 'ঐ সকল ব্যক্তিকে খতম করতে হবে; যারা সশস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।'

নিজামীর কাছে পাকিস্তান ছিল 'আল্লাহর প্রিয় ভূমি'। একাত্তরে চট্টগ্রামে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁর প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্যে ঈমানদার মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা যখন রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা রাজনৈতিক পন্থায় করতে ব্যর্থ হল, তখন আল্লাহ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তাঁর প্রিয়ভূমির হেফাজত করেছেন।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৪ আগস্ট, ১৯৭১)

ওই সময় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে ভারতীয় এজেন্ট বলে অভিহিত করেছিলেন নিজামী। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বাঙালি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান করাচির মাসরুর বিমানঘাঁটি থেকে একটি জেট বিমান ছিনতাই করে পালিয়ে আসার সময় কো-পাইলট রশীদ মিনহাজ তাকে বাধা দেয়। এ

নিয়ে তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলে একপর্যায়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। শহীদ হন মতিউর। মিনহাজও নিহত হয়। কিন্তু নিজামী তখন মিনহাজের পিতার কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ বীর মতিউরকে ভারতীয় এজেন্ট বলে উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রাম-এ 'মিনহাজের পিতার নিকট ছাত্রসংঘ প্রধানের তারবার্তা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ থেকে এ কথা জানা যায়।

সংগ্রাম ৮ নভেম্বর ১৯৭১

বদর দিবস পালিত

ব্রাহ্মণবাদী ভারতের সকল চক্রান্ত বরবাদ কর

জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৯৭১ সালে ছিলেন ইসলামী ছাত্রসংঘের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি। সেই সুবাদে তিনি ছিলেন ঢাকার আলবদর বাহিনীর কমান্ডার। 'বদর দিবস' উপলক্ষে ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর ঢাকায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামী ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, 'আগামীকাল থেকে কোনো লাইব্রেরি হিন্দুদের ও হিন্দুস্তানী দালালদের লেখা বই-পুস্তক বেচাকেনা করতে পারবে না, আগামীকাল থেকে কোথাও হিন্দু বা হিন্দুস্তানী দালালদের বই-পুস্তক বেচাকেনা হতে দেখলে তা ভস্মীভূত করা হবে।' (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ৮ নভেম্বর, ১৯৭১)। ওই সমাবেশে আরো বক্তব্য রেখেছিলেন সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী।

একাত্তরের ১৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর ছাত্রসংঘের এক অনুষ্ঠানে মুজাহিদ বলেছিলেন, 'ঘৃণ্য শত্রু ভারতকে দখল করার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের আসাম দখল করতে হবে। এজন্য আপনারা সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।' ওই দিন দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত মুজাহিদের একটি নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র—যুক্তি নয়'। ২৫ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার প্রতি দুষ্কৃতকারী (মুক্তিযোদ্ধা) খতম করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। পরদিন দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয় এ খবর।

জামায়াতে ইসলামীই যে ঘাতক রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠন করে তার আরো প্রমাণ আছে দৈনিক সংগ্রামের পাতায়। একাত্তরের ৬ আগস্ট পত্রিকাটিতে 'রংপুর জেলায় ৬ হাজারেরও বেশি রেজাকার ট্রেনিং নিচ্ছে' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, 'পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রংপুর জেলার সেক্রেটারী মওলানা কাজী নজমুল হুদা রেজাকার বাহিনীর সংগঠক।' এতে আরো বলা হয়, 'রংপুর শহর জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব মুখলেসুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব জবানউদ্দিন আহমদ ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর প্রিন্সিপাল রুহুল ইসলামও তাদের উপর ন্যস্ত বিভিন্ন থানা এলাকা সফর করে রেজাকার বাহিনী গঠন করছেন এবং বিভিন্ন ট্রেনিং কেন্দ্র তদারক করছেন।'

সে বছর ১৬ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এক খবরে কামরুজ্জামানের পরিচয় দেওয়া হয় 'আল-বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক' হিসেবে। ওই খবরে বলা হয়, 'পাকিস্তানের ২৫তম আজাদী দিবস উপলক্ষে গত শনিবার মোমেনশাহীতে আল-বদর বাহিনীর উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এ সিম্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেন আল-বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক জনাব কামরুজ্জামান।'

রাজাকার বাহিনীর নৃশংসতায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অন্য সহযোগীদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ কেউ এমনকি ক্ষোভও প্রকাশ করেন। এ ঘাতক বাহিনীর ওপর জামায়াতে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণও তাদের উষ্মার কারণ ছিল। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল বলেই জামায়াতে ইসলামী রাজাকার বাহিনীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমর্থন করে গেছে এবং বিরোধিতাকারীদের করেছে কঠোর সমালোচনা। একাত্তরের ৪ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক (পূর্ব পাকিস্তান) মজলিশে শূরার বৈঠকে গোলাম আযম বলেন, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় জামায়াতে ইসলামী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। আর এর প্রেরণা একটিই—দলীয় আদর্শ। দেশের শত্রুরা জানে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে জামায়াতের কর্মীরা।'

দলের পাকিস্তানের আমির মাওলানা আবু আলা মওদুদী ৯ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে লাহোরে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীদের এক সভায় বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে খতম করা হবে। আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া, পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় শেখ মুজিবের ভ্রান্ত পদক্ষেপ মোকাবেলায় এগিয়ে আসে এবং দাসত্বে আবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করে।'

পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ইয়াহিয়া খানের চক্রান্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু ২৫ মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর পর তিনি এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও ক্ষমতার ভাগ থেকে বঞ্চিত হন। সামরিক শাসকদের প্রধান দোসর হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আবির্ভাবে তিনি স্পষ্টতই নাখোশ ছিলেন। রাজাকার বাহিনীর নৃশংসতার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন : 'পাকিস্তানী কর্তৃক পাকিস্তানী হত্যা বন্ধ করতে হবে।'এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গোলাম আযম বলেন, 'ভুট্টো কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের বোকা বানাতে পারবেন না।' সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান 'পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর কাজের সমালোচনা করলে তার জবাবে জামায়াতের দলীয় মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ২ অক্টোবর 'রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার আর নয়' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে আসগর খানকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত

করে। এতে লেখা হয়, 'শান্তি কমিটি এবং রাজাকার-বদর বাহিনী ও মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা বুকের রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করছে'। আসগর খানের প্রতি তাদের ক্ষোভের মাত্রা এতোটাই বেশি ছিল যে, তাকে 'হিন্দুস্থানের দালাল' বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী রাজাকার বাহিনী গঠনের পর এর সদস্য সংখ্যা আরো বাড়ানো এবং তাদের ভারি অস্ত্রে সজ্জিত করার দাবি তোলে। দেশের সর্বত্র মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বাড়ছে এ খবর দিয়ে সংগ্রামে ৭ অক্টোবর লেখা হয়, 'প্রদেশের অভ্যন্তরে দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করতে হলে সংশিস্নষ্ট এলাকায় নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমে রেজাকার বাহিনী গঠন এর মোক্ষম হাতিয়ার। রাজাকারদের ভারি অস্ত্র দেওয়াও আবশ্যক।' ঢাকা মেডিকেল কলেজে দায়িত্ব পালনকালে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তিন রাজাকারের মৃত্যুতে সংগ্রামে ১১ অক্টোবর সম্পাদকীয় লেখা হয় 'গৌরবের মৃত্যু' শিরোনামে। এতেও 'রাজাকারবাহিনীকে দুষ্কৃতকারীদের দমনে আরো অধিক কলাকৌশল শিক্ষাদানের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভারি অস্ত্র প্রদানের' অনুরোধ জানানো হয়।

রাজাকার ও আলবদর বাহিনী জামায়াতে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে—ক্রমাগত এ অভিযোগ উঠতে থাকায় দলের 'পূর্ব পাকিস্তান' শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক ১৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, 'এ বাহিনী বিশেষ কোনো দলের নয়, বরং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন।' তিনি রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে তাদের প্রশংসা করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

রাজাকারদের নৃশংসতার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো, কাওসার নিয়াজি, আসগর খান প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতার বিভিন্ন মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা আলী আহসান মুজাহিদ। তিনি বলেন, 'জাতি রক্ষার জন্য তারা (রাজাকাররা) এগিয়ে এসেছে।' সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তিনি ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। মুজাহিদ পরে (৭ নভেম্বর ১৯৭১) বদর দিবসে আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে দেওয়া না যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।' মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন, 'সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আলবদর তরুণরা সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানের অস্তিত্ব খতম করে দেবে।' পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি নিজামী আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার অভিলাষ পূরণ হয়নি। তবে একাত্তরে তার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নৃশংসতায় বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

ঘাতক রাজাকার বাহিনী নিয়ে অন্যদের আপত্তি সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক তাই বইয়ে বলেছেন, 'সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত একটি

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম পক্ষের গোপন রিপোর্ট

পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

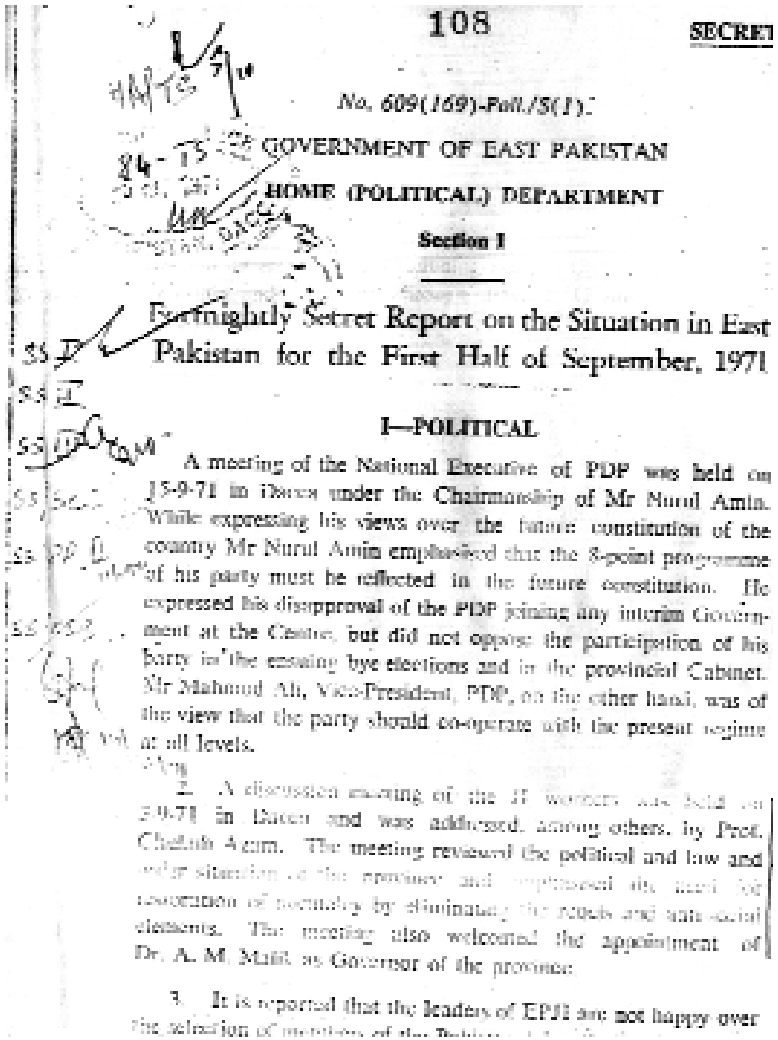

108

SECRET

No. 609(169)-Poll./S(I).

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

HOME (POLITICAL) DEPARTMENT

Section I

Fortnightly Secret Report on the Situation in East Pakistan for the First Half of September, 1971

I—POLITICAL

A meeting of the National Executive of PDP was held on 15-9-71 in Dacca under the Chairmanship of Mr Nurul Amin. While expressing his views over the future constitution of the country Mr Nurul Amin emphasised that the 8-point programme of his party must be reflected in the future constitution. He expressed his disapproval of the PDP joining any interim Government at the Centre, but did not oppose the participation of his party in the ensuing bye elections and in the provincial Cabinet. Mr Mahmud Ali, Vice-President, PDP, on the other hand, was of the view that the party should co-operate with the present regime at all levels.

2. A discussion meeting of the JI workers was held on 3-9-71 in Dacca and was addressed, among others, by Prof. Ghulam Azam. The meeting reviewed the political and law and order situation of the province and emphasised the need for restoration of normalcy by eliminating the rebels and anti-social elements. The meeting also welcomed the appointment of Dr. A. M. Malik as Governor of the province.

3. It is reported that the leaders of EPJI are not happy over the selection of members of the ...

রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল জেনারেল নিয়াজির কাছে অভিযোগ করেন যে, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। এরপর জেনারেল আমাকে তার অফিসে ঢেকে নেন এবং বলেন, আজ থেকে তুমি রাজাকারদের আল-বদর ও আল-শামস নামে অভিহিত করবে। এর দ্বারা এই ধারণা দেওয়া যাবে যে, তারা কোনো একক পার্টির লোক নয়।' আল-বদর ও আল-শামস সম্পর্কে সিদ্দিক সালিকের মূল্যায়ন হলো, 'তারা সেনাবাহিনীকে সাহায্যের ব্যাপারে ছিল আন্তরিক। তারা কাজ করে প্রচুর। ভোগেও সীমাহীন।'

'পূর্ব পাকিস্তান' সরকারের গোপন প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াত ও এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ নেতাদের নানা অপকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় ওই সময়কার 'পূর্ব পাকিস্তান' সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন প্রতিবেদনেও। পূর্ব পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখা ১৯৭১ সালে এই 'প্রদেশে' তখনকার পরিস্থিতি নিয়ে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারকে মাসে দু'বার গোপন প্রতিবেদন পাঠাত। প্রতিবেদনের অফিসিয়াল শিরোনাম ছিল 'ফর্টনাইটলি সিক্রেট রিপোর্ট অন্য দ্য সিচুয়েশন ইন ইস্ট পাকিস্তান'। ওই প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর তখনকার আমির গোলাম আযম, পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী, ছাত্রসংঘের পূর্ব পাকিস্তান সভাপতি আলী আহসান মো. মুজাহিদ, ছাত্রসংঘের রংপুরের নেতা এটিএম আজহারুল ইসলাম কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের শায়েস্তা করতে তৎপর ছিলেন—এসবের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। নিজামী, মুজাহিদ ও এটিএম আজহার বর্তমানে যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামীর আমির, সেক্রেটারি জেনারেল ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল।

সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধের প্রতিবেদনে [নম্বর ৬০৯ (১৬৯) পল/এস (আই)] বলা হয়েছে, ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জামায়াতের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে গোলাম আযমসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রদেশের রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে 'বিদ্রোহীদের' (মুক্তিযোদ্ধা) নির্মূল করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

(A discussion meeting of the JI workers was held on 3-9-71 in Dacca and was addressed, among others, by Prof. Ghulam Azam. The meeting reviewed the political and law and order situation of the province and emphasised the need for restoration of normalcy by eliminating the rebels and anti-social elements.)

আরেক গোপন প্রতিবেদনে দেখা যায়, একাত্তরের ১৪ জুন ময়মনসিংহ জেলার

জামালপুর মহকুমায় ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংঘের তৎকালীন সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেনাবাহিনী যেভাবে কাজ করছে তাতে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলাম রক্ষায়

১৯৭১ সালের অক্টোবরের প্রথম পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাঠানো গোপন রিপোর্ট

SECRET

No. 686(172)-Poll./S(I).

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

HOME (POLITICAL) DEPARTMENT

Section I

Fortnightly Secret Report on the Situation in East Pakistan for the First Half of October, 1971

I—POLITICAL

With the announcement of the Government decision to hold bye-elections in East Pakistan, the tempo of political activities has somewhat increased in the province. The three factions of the PML, JI, PDP, JUI and NI have been trying to forge an election alliance among themselves. Some political leaders are of the view that free and fair elections are not possible in the present circumstances prevailing in East Pakistan. They feel that it might become a veritable problem to hold the elections peacefully in view of the present law and order situation, if the parties intending to contest the elections do not arrive at a consensus among themselves.

2. An extended meeting (50) of the Executive Committee of East Pakistan Regional PDP was held on 3-10-71 at the Dacca residence of Mr Nurul Amin with himself in the chair. The meeting discussed the present political situation and deteriorating economic condition of the country and favoured participation in the ensuing bye-elections. Some of the speakers mentioned about the atrocities committed by the enemies as well as by the Jamaat-e-Islami workers and Razakars on innocent people in the rural areas. They demanded that some political leaders should be allowed to remain in the Reception Centres so that the displaced persons could come back with confidence. Resolutions, inter-

পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে। এ জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি।

প্রতিবেদনের মে মাসের প্রথম ভাগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫ মে ঢাকা নগর জামায়াতের এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমির গোলাম আযম পাকিস্তান রক্ষার্থে কী কী করণীয় সে বিষয়ে দলের নেতাদের নির্দেশ দেন। সব কলকারখানা চালু রেখে দেশে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে—এই পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপারেও সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা করতে বলেন। ১১ মে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী রহমত আলী ও মেজর জেনারেল (অব.) ওমরাহ খান ঢাকায় আসেন। গোলাম আযমসহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করে তারা জামায়াত কর্মীদের পাকিস্তান সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের বিভক্তি যে কোনোভাবে রুখতে হবে—এই নির্দেশ দেন তারা।

'পূর্ব পাকিস্তান' সরকারের একটি দলিলে [নম্বর ৪৮২/১৫৮-পল./ এস (আই)] দেখা যায়, ৪ আগস্ট খুলনা জেলা জামায়াতের এক সভায় আমির গোলাম আযম তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবকে আখ্যা দেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে। তিনি বলেন, মুজিব দেশের মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। গোলাম আযম 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' ধ্বংস করতে জামায়াতের নেতৃত্বে অন্যদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ওই সভায় আরো বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে হবে, দেশ পরিচালনা হবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্থানীয় মিউনিসিপাল হলের এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুস সাত্তার। সাত্তার ২০০১ সালে বাগেরহাট-৪ আসন থেকে জামায়াতের মনোনয়নে সাংসদ নির্বাচিত হন। ২৮ আগস্ট ১৯৭১-এ দেওয়া ওই প্রতিবেদনে সই করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব এমএম কাজিম।

আরেক প্রতিবেদনে [নম্বর ৫৪৯ (১৫৯)-পল. এস (আই)] দেখা যায়, আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সম্মেলনে গোলাম আযম বলেন, 'হিন্দুরা মুসলমানদের অন্যতম শত্রু। তারা সব সময় পাকিস্তানকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে।' সম্মেলনে গোলাম আযম প্রতি গ্রামে শান্তি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী আখ্যা দিয়ে তাদের দমনের ব্যাপারেও নির্দেশ দেন তিনি। তিনি বলেন, খুব শিগগিরই রাজাকার, মুজাহিদ ও পুলিশ মিলিতভাবে দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলায় সক্ষম হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে স্বরাষ্ট্র সচিব এই প্রতিবেদনে সই করেন।

অক্টোবরের দ্বিতীয় ভাগের সরকারি গোপন প্রতিবেদনে (১৩ নভেম্বর ১৯৭১

স্বরাষ্ট্র সচিব সাক্ষরিত) বলা হয়েছে, ১৭ অক্টোবর রংপুরে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সভায় আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আল-বদর বাহিনী গড়ে তুলতে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশন দেন। তিনি বলেন, ইসলামবিরোধী শক্তিদের প্রতিহত করতে হবে। এজন্য যুবকদের সংগঠিত করে আল-বদর বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এটিএম আজহারুল ইসলাম।

আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭ নভেম্বর জামায়াতে ইসলামী আল-বদর দিবস পালন করে। দলের নেতারা ওই দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আল-বদর বাহিনীতে জনগণকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'যারা পাকিস্তান চায় না তারা আমাদের শত্রু। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে এবং শত্রুদের প্রতিহত করতে হবে।' এদিকে ১৪ নভেম্বর ঢাকা নগর জামায়াতের ২০ সদস্যবিশিষ্ট মজলিশে শুরার বৈঠকে আবারো পাকিস্তান রক্ষায় জেহাদের ডাক দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় ভাগের গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর সিলেটে এক সভায় মতিউর রহমান নিজামী আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে বলেন, তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী মুসলমানদের খেপিয়ে তুলেছে। হাত মিলিয়েছে ভারতের সঙ্গে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামী ছাত্র সংঘ ও জালালাবাদ ছাত্র সমিতি যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। এই প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্র সচিব এম এম কাজিম সই করেন ১৫ অক্টোবর ১৯৭১।

অন্যদিকে ৬ সেপ্টেম্বর ইসলামী ছাত্রসংঘ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায় 'পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দিবস' পালন করে। সভায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বাত্মক কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিব সাক্ষরিত সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগের প্রতিবেদনে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে।

ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এর আগে ৩ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে গোলাম আযম পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেন দলের নেতা-কর্মীদের। একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতিহত করার নির্দেশও দেন। সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ডা. এম এ মালেকের নিয়োগকে স্বাগত জানান। প্রসঙ্গত ১৭ সেপ্টেম্বর গভর্নর এম এ মালেক ৯ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ করান। এতে জামায়াতের দুজন ছিলেন। এরা হলেন প্রয়াত আব্বাস আলী খান ও মাওলানা একেএম ইউসুফ। আব্বাস আলী খান ছিলেন জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির।

অক্টোবর মাসের প্রথম পক্ষের রিপোর্টে উল্লেখ আছে, ৩ অক্টোবর ঢাকায় নূরুল আমীনের বাসায় তার সভাপতিত্বে পিডিপি নির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনাশেষে আসন্ন উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেওয়া হয়। ওই সভায় কয়েকজন বক্তা গ্রামাঞ্চলে নিরীহ জনগণের ওপর জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও রাজাকারদের নৃশংসতার বিষয়টি তুলে ধরেন। রিপোর্টটির স্মারক নং 686(172)-Poll./S(1). এতে বলা হয়েছে :

An extended meeting (50) of the Executive Committee of East Pakistan Regional PDP was held on 3-10-71 at the Dacca residence of Mr Nurul Amin with himself in the chair. The meeting discussed the present political situation and deteriorating economic condition of the country and favoured participation in the ensuing by-elctions. Some of the speakers mentioned about the atrocities committed by the enemies as well as by the Jamaat-e-Islami workers and Razakars on innocent people in the rural areas.

মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ দৈনিক সংগ্রামে 'বদর দিবস : পাকিস্তান ও আল-বদর' শিরোনামে এক উপসম্পাদকীয়তে তার দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতি পাকিস্তান রক্ষায় আক্রমণাত্মক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, '...শুধু পাকিস্তান রক্ষার আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালিয়েই এ পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না।' ওই লেখায় নিজামী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের 'মুনাফিক' আখ্যা দিয়ে বলেন, '...দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের কিছু মুনাফিক তাদের (ভারতের) পক্ষ অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদের দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের মোকাবেলা করে তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে।'

এর আগে ৯ সেপ্টেম্বর সংগ্রামে 'আল-বদর' শীর্ষক একটি লেখায় বলা হয়, 'আল-বদর, একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী, আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী, আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীর কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।' সত্যিকর অর্থেই একাত্তরে বাঙালি জনগণের কাছে আজরাইলের মতো ছিল আল-বদর। এ প্রসঙ্গে মার্কিন লেখক রবার্ট পেইন তার বইয়ে লিখেছেন, '...ধর্মান্ধ ছাত্রদের নিয়ে গোপনে তৈরি হলো আল-বদর বাহিনী। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের গোপনে হত্যার চক্রান্ত করে। শুধু গোপন চক্রান্তই নয়, আল-বদররা এইসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে সে সময় আরো একটি সংগঠন তৈরি করা হয়।

এর নাম ছিল আল-শামস।' রবার্ট পেইন আরো বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি সংগঠনের ধর্মান্ধ মানুষগুলোকে নিয়ে ধর্মরক্ষার নামে উদ্বুদ্ধ করে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ গোপনে গঠন করেছিল এ দল। এদের অনুগত সহযোগিতায় আরো হত্যায় বিষাদক্লিষ্ট হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। এরা আওয়ামী লীগ নেতাদের ধরা বা হত্যা করার ব্যাপারে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগিতা করেছিল খুব।'

বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন

২৭ অক্টোবর ১৯৭১ লন্ডনের 'ফিন্যানসিয়াল টাইমস' পত্রিকায় 'নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ চলছেই' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেল লাইনের দুপাশে বিস্তৃত আবাসিক এলাকা দয়াগঞ্জের ২শ' বর্গগজ আয়তনের একটি ভস্মীভূত অংশ প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সৈন্য, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী রাজাকাররা এক সপ্তাহ আগে সেখানে বেশ কিছু বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করে।'

রাজাকারদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে ২০ জুন ১৯৭১ তারিখে সানডে টাইমস-এ 'পাকিস্তানে সংঘবদ্ধ নির্যাতন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গেস্টাপো কায়দায় যখন তখন লোকজনকে তুলে নেওয়ার ঘটনায় এ অঞ্চলে নতুন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে প্রকাশ্যে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছিল তাদের মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যেত রাজাকাররা।...মুক্তিফৌজে যোগদানকারী বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর খালেদ মোশাররফের দুই সন্তানকে

ইত্তেফাক ২৩-১২-১৯৭১

নরপিশাচ আল-বদরের আরেকজন গ্রেফতার: অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত

রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায়।...নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ধারণা, অবাঙালিদের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর জুনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছে রাজাকাররা। কারো কারো পরিবারের কাছে মুক্তিপণও চাওয়া হয়। একটি পরিবার মুক্তিপণ দিয়েও কোনো ফল পায়নি।' প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, 'হত্যা ও নির্যাতনের বাইরেও এখন রাজাকাররা তাদের অপারেশন বিস্তৃত করেছে। তারা মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে পতিতা বানাচ্ছে। ধরে নেওয়া তরুণীদের দিয়ে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের রাতের মনোরঞ্জনের জন্য চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে তারা একটি ক্যাম্প বানিয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা বলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে তারা। তাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসেনি। নামকরা বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌসী এরকম পরিস্থিতি থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন।'

বদর বাহিনীর মাস্টার প্লান অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী হত্যা

ঢাকায় বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে গভর্নর হাউসে এক সভায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে তাদের হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও ঘাতক আল-বদরদের। একই কৌশলে দেশের প্রধান শহরগুলোতেও বুদ্ধিজীবীসহ শিক্ষিত লোকদের স্থানীয় সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি অফিসে আমন্ত্রণ করে নিয়ে হত্যা করে এ দেশকে সম্পূর্ণ মেধাশূন্য করার চক্রান্ত ছিল ঘাতকদের। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ দৈনিক আজাদ-এ 'আর একটা সপ্তাহ গেলেই ওরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সবাইকেই মেরে ফেলত–বদর বাহিনীর মাস্টার প্লান' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে এ পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। এ

আজাদ
THE AZAD

বদর বাহিনীর মাস্টার প্লান

পরিকল্পনা তারা ঠিক ঠিক মতো কার্যকর করতে না পারলেও যেটুকু করেছে তার বিবরণ পড়েই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে তখন বিশ্ববাসী। একাত্তরের ডিসেম্বরে চূড়ান্ত পরাজয়ের মাত্র কয়েক দিন আগে বদর বাহিনীর হায়েনারা ঢাকায় শত শত বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখে কয়েকটি বধ্যভূমিতে। ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি দৈনিক আজাদে অধ্যাপিকা হামিদা রহমানের লেখা 'কাটাসূরের বধ্যভূমি' শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা ছিল রায়ের বাজার বধ্যভূমির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সেলিনা পারভীন, ড. ফজলে রাব্বী, সিরাজউদ্দিন হোসেন, ড. আলীম চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া যায় সেখানে। দৈনিক আজাদের ওই নিবন্ধে বলা হয়, 'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

বুদ্ধিজীবী হত্যার আরেকটি বধ্যভূমি হলো শিয়ালবাড়ি, যেখানে পড়ে স্থাপন করা হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি সম্পর্কে আনিসুর রহমানের লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ দৈনিক পূর্ব দেশ-এ। এতে বলা হয় ''সত্যি আমি যদি মানুষ না হতাম। আমার যদি চেতনা না থাকতো। এর চেয়ে যদি হতাম কোনো জড়পদার্থ। তাহলে শিয়ালবাড়ির ঐ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী এই দ্বিপদ জন্তুদের সম্পর্কে এতোটা নিচ ধারণা করতে পারতাম না। ...অথবা যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়িতে। তাহলে দেখতে হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। ...ক' হাজার লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে? যদি বলি দশ হাজার, যদি বলি বিশ হাজার, কি পঁচিশ হাজার তাহলে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?... আমরা শিয়ালবাড়ির যে বিস্তীর্ন বন-বাদাড়পূর্ণ এলাকা ঘুরেছি তার সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকঙ্কাল আর নরকঙ্কাল।''

দৈনিক সংগ্রাম

আল-বদরদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের এতো লাশ ওই দুটি বধ্যভূমিতে পাওয়া যায় যে, তাদের দাফন করাও কঠিন

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বিষয়ে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ দৈনিক বাংলায় কালো বর্ডার দেওয়া হেডিংয়ে মোটা অক্ষরে লেখা এক আবেদনে বলা হয়েছিল, 'জামাতে ইসলামীর বর্বর বাহিনীর নিষ্ঠুরতম অভিযানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের অসংখ্য লাশ এখনো সেইসব নারকীয় বধ্যভূমিতে সনাক্তহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ...এ পর্যন্ত তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করা যায়নি।'

আল-বদরদের আরেকটি অবিশ্বাস্য নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরা হয় ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২ দৈনিক পূর্বদেশে এক প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, 'হানাদার পাকবাহিনীর সহযোগী আল-বদরের সদস্যরা পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের পর যখন পালিয়ে গেল তখন তাদের হেডকোর্টারে পাওয়া গেল এক বাস্তা বোঝাই চোখ। এদেশের মানুষের চোখ। আল-বদরের খুনিরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।'

এসবই হলো রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসের ঘৃণ্য অপরাধের সামান্য নমুনা মাত্র। এছাড়া সারা দেশে অসংখ্য মানুষ আছেন যারা একাত্তরে এসব ঘাতক বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর পাঁচ শতাধিক নির্বাচিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছে। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনেও শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যসহ অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। যেমন ২০০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর চ্যানেল আইয়ে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা দেন কীভাবে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের বাচ্চু রাজাকারের নেতৃত্বে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। প্রামাণ্যচিত্র 'টিয়ার্স অব ফায়ার'-এ ঠাঁই পেয়েছে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী ও নাদিম কাদিরসহ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার। ১৯৯৫ সালে ব্রিটেনের টোয়েন্টি টোয়েন্টি টেলিভিশন নির্মাণ করে প্রামাণ্যচিত্র 'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল'। ওই সময় লন্ডনে বসবাসরত তিন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী চৌধুরী মঈনউদ্দীন, আবু সাঈদ ও লুৎফর রহমান একাত্তরে যে-যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করে তা নিয়েই নির্মাণ করা হয় প্রামাণ্যচিত্রটি। এদের মধ্যে আল-বদর হাইকমান্ডের অন্যতম সদস্য চৌধুরী মঈনউদ্দীন ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের 'অপারেশন ইনচার্জ'।

একাত্তরে বাংলাদেশের নির্বাচিত (সত্তরের নির্বাচনে) জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং দেশ পরিচালনার জন্য সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণের পর জামায়াতে ইসলামী দলগতভাবে যেসব তৎপরতা চালায় তা স্পষ্টতই রাষ্ট্রদ্রোহ ও যুদ্ধাপরাধ। এছাড়া সশস্ত্র ঘাতক বাহিনী তৈরি করে তাদের দিয়ে ব্যাপক হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বুদ্ধিজীবী হত্যা, মেয়েদের ধরে নিয়ে সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনাগুলো গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩' অনুযায়ী পত্র-পত্রিকায়

প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা সম্ভব। আর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী তো রয়েছেই। কাজেই যতই তারা আস্ফালন করুক কিংবা কিছু ছদ্মবেশী নব্য-রাজাকার একাত্তরের ঘাতক রাজাকার আল-বদরদের রক্ষার চেষ্টা করুক না কেন, শেষরক্ষা তাদের হবে না।

একটি মহল ইদানীং মার্কা মারা কিছু রাঘব-বোয়াল রাজাকার আল-বদর নেতাকে বাদ দিয়ে দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে 'পরিচ্ছন্ন' করার ফর্মুলা দিচ্ছেন। তারা এ বিষয়টি বুঝেও সম্ভবত না বোঝার ভান করছেন যে, একাত্তরে জামায়াতের কিছু নেতা কেবল ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন এমন নয়। পুরো দলই তখন ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর সেই নেতারাই এখনো দলটি চালাচ্ছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, 'বর্তমানে জামায়াতের কেন্দীয় নির্বাহী কমিটির ১৫ সদস্যের মধ্যে ১১ জনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধিতার প্রমাণ আছে। তারা হলেন—আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ, জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির (সহ-সভাপতি) আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ, নায়েবে আমির মকবুল আহমেদ, জ্যেষ্ঠ সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, দুই সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা ও এটিএম আজহারুল ইসলাম এবং চার শীর্ষস্থানীয় নেতা মুহাম্মদ সুবহান, দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী, আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ জাহেদ ও মীর কাসেম

কমান্ডার ফিরোজ মিয়ার নেতৃত্বে রাজাকারদের কুচকাওয়াজ

আলী (নয়া দিগন্ত-এর পরিচালক বোর্ডের চেয়ারম্যান)। কেন্দীয় কমিটির আরো দুই সদস্য নাজির আহমদ ও রফিউদ্দিন আহমদ নিজ এলাকায় স্বাধীনতাবিরোধী বলে পরিচিত। কমিটির অন্য দুই সদস্যের মধ্যে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যে ছিলেন, আর রফিকুল ইসলাম খান ছিলেন সে সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক।' এতে বোঝাই যায় যে, জামায়াতের এখনো 'লোম বাছলে গা উজাড়' হওয়ার মতোই অবস্থা। এছাড়া জামায়াতে নতুন প্রজন্মের যেসব নেতা-কর্মী আছেন তারাও কখনো একাত্তরে দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বলে শোনা যায় না। কাজেই এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের (নাকি ছদ্মবেশী জামায়াতী!) ওকালতি মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দোহাই দিয়েও কেউ কেউ জামায়াতী ও রাজাকার আল-বদরদের বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ চেষ্টাও সফল হবে না। কারণ একাত্তরে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নির্যাতনের মতো গুরুতর অপরাধে জড়িতদের ক্ষমা করা হয়নি। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও এ ধরনের অপরাধীদের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচার চলছিল। স্বাধীনতার পর থেকে '৭৩-এর ৩১ নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৪৭১ জন রাজাকার, আল-বদর ও দালালকে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর প্রায় ২৬ হাজার মুক্তি পায়। অবশিষ্ট প্রায় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী বিচারের আওতায় ছিল। এদের মধ্যে ২ হাজার ৮৪৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়েছিল। বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছিল ৭৫২ জনের। ১৯ জনের হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। প্রথম মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল কুষ্টিয়ার কুখ্যাত রাজাকার চিকন আলীকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া যুদ্ধাপরাধীদের অন্যতম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালিক, '৭১-এর দালল মন্ত্রিসভার সদস্য জামায়াত নেতা মাওলানা ইউসুফ, বিএনপি নেতা ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাহজাহান, কৃষক শ্রমিক পার্টির এসএম সোলায়মান প্রমুখ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের পর ওই বিচার প্রক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের আমলে দ্য বাংলাদেশ কলাবরেটর'স (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল'স) রিপিল অর্ডিন্যান্স-১৯৭৫ জারির মাধ্যমে দালাল আইন বাতিল করে সাজাপ্রাপ্ত, বিচারাধীন ও আত্মগোপনকারী যুদ্ধাপরাধীদের অভিযোগমুক্ত করা হয়। কিন্তু এখনো এদের বিচার করতে নেই কোনো আইনগত বাধা, অভাব নেই সাক্ষ্য-প্রমাণেরও। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ফলে দালাল আইন বাতিলের অধ্যাদেশ অবৈধ হয়ে গেছে।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট : মগ্ন মৈনাকচূড়া

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে ইসলামাবাদে আলোর মুখ দেখতে পায় হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট। তবে পুরোপুরি ঝলমলে আলোয় রিপোর্টটি বেরিয়ে এসেছে, এমনটি বলা যাবে না। পাকিস্তানের সামরিক সরকার খুব কায়দা করে কঠোর নিরাপত্তা ও বিধিনিষেধের বেড়াজালে রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ (Declassified) করে সে বছরের ৩০ ডিসেম্বর। ইসলামাবাদে ন্যাশনাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার লাইব্রেরিতে রাখা হয় রিপোর্টটি। পাকিস্তানি পত্রপত্রিকার খবরে জানা যায়, সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনউদ্দিন হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ওই রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা কৌশল অবলম্বন করে। কমিটিতে আরো ছিলেন পাকিস্তানের মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পররাষ্ট্র সচিব।

এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বিদেশি পত্রপত্রিকায় হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের কোনো কোনো অংশ প্রকাশ পেয়েছে। সবশেষে ২০০০ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় পত্রিকা 'ইন্ডিয়া টুডে'র ওয়েবসাইটে এ রিপোর্টের সম্পূরক অংশ পুরোটা প্রকাশিত হলে তা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানে বিভিন্ন মহলে। রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা এ রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। পাকিস্তানের বিশিষ্ট কলামিস্ট এম বি নাকভি এক নিবন্ধে বলেন, সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু লোকের ধারণা এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হলে তা জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হবে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যুদ্ধের ৩০ বছর পর এতে আর ক্ষতির কী আছে? ক্ষতি যা হওয়ার তা তো ১৯৭১ সালেই হয়ে গেছে। সারা বিশ্ব তখন পাকিস্তানিদের 'নরপিশাচ' বলে জেনেছে।

অবশেষে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এ রিপোর্ট প্রকাশের অঙ্গীকার করলেও এর স্পর্শকাতর অংশগুলো গোপন রাখার লক্ষ্যে একটি কমিটি করে দেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিপোর্টটির নির্বাচিত অংশ সাংবাদিকদের কেবল পড়া ও নোট নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কোনো রকম ফটোকপি করা কিংবা টাইপ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

রিপোর্টটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের

ইংরেজি দৈনিক 'দ্য নেশন' জানায়, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের মোট ৬৭৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৪৪ থেকে ২১২, ২৩৬ থেকে ২৩৭ এবং ৪৪১ থেকে ৪৪২ নম্বর পৃষ্ঠা গোপন রাখা হয়েছে। কয়েকটি দেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ের উল্লেখ থাকায় ওই পৃষ্ঠাগুলো প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকটি দেশের বিতর্কিত ভূমিকার কথাসহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলের জন্য 'ক্ষতিকর' ঐতিহাসিক তথ্যগুলোও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর সমালোচনামূলক এ রিপোর্টের মূল অংশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বর্তমান (২০০০ সালের) সামরিক সরকারেরও বিরুদ্ধে যেতে পারে—এ আশঙ্কায় সেগুলো 'বৈদেশিক সম্পর্কের জন্য স্পর্শকাতর' আখ্যা দিয়ে গোপন রাখা হয়েছে বলে পত্রিকাটির ধারণা।

ইংরেজি দৈনিক 'দ্য নিউজ'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সামরিক সরকার কিছু অংশ গোপন রেখে রিপোর্টটি প্রকাশের সাহস দেখালেও এমন কিছু নিয়ম-কানুন চালু করেছে, যাতে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের পক্ষে এর নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। খবরে বলা হয়, সাংবাদিকদের কেবল সরকারি অফিস সময় বিকেল ৩টা পর্যন্ত রিপোর্টটি দেখা, পড়া ও নোট নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অনেক অনুরোধের পর অবশ্য অফিস সময়ের পরও কারো কারো পক্ষে এটি পড়ার সুযোগ মিলছে। তবে কেবিনেট ব্লকের কড়া নিরাপত্তা পেরিয়ে কোনো সাধারণ নাগরিক এটি পড়তে যাওয়ার সাহস দেখাননি।

যে জন্য ও যাদের নিয়ে কমিশন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের 'দুর্ধর্ষ ও সাহসী' বলে পরিচিত বিশাল সেনাবাহিনীর অপমানজনক পরাজয় এবং পাকিস্তান 'ভেঙে যাওয়ার' কারণ খতিয়ে দেখার জন্য সে বছরেরই ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশ বলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গোপন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট ১৯৫৬-এর অধীনে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে প্রধান করে সরকার এ তদন্ত কমিশন গঠন করে। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুর রহমানকে কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। এ কমিশন হামুদুর রহমান কমিশন নামেই পরিচিত।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আলতাফ

কাদিরকে কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা এবং পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের সহকারী রেজিস্ট্রার এম এ লতিফকে সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে কমিশনের লিগ্যাল এডভাইজার নিযুক্ত হন কর্নেল এম এ হাসান।

কমিশন ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে গোপন শুনানি শুরু করে এবং ২১৩ জনের সাক্ষ্য নেয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দলিল গ্রহণ করে। সে বছরের ১২ জুলাই কমিশন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করে। সে সময় কমিশন একথাও বলে যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে' যুদ্ধের চূড়ান্তপর্যায়ে ও আত্মসমর্পনকালে কর্তব্যরত সেনাকর্মকর্তারা ভারতে যুদ্ধবন্দি অবস্থায় থাকায় তাদের সাক্ষ্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি রিপোর্ট। ১৯৭৪ সালে যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে ফিরে গেলে সরকারি নির্দেশে কমিশন আবার কাজ শুরু করে। তখন লাহোরে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট ভবনে স্থাপন করা হয় কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আত্মসমর্পনের প্রকৃত কারণ কারো জানা থাকলে তা লিখিতভাবে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কমিশন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তথ্য প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। তথ্য প্রদানকারীদের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয় তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় বিজ্ঞপ্তিতে। সেই সঙ্গে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় সব তথ্য গোপন রাখারও।

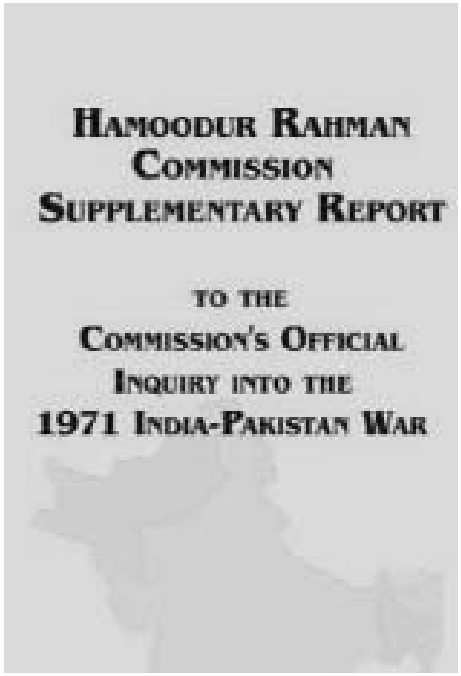

অহেতুক খাটাখাটি!

তদন্তের এ পর্যায়ে ৭২ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, মেজর

জেনারেল রাও ফরমান আলী ও 'পূর্ব পাকিস্তানে' বিভিন্ন ডিভিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত জেনারেলরা, পূর্বাঞ্চলীয় নৌবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ, বিমান বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা এয়ার কমোডর ইনাম, চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এম মাহমুদ আলী চৌধুরী এবং বেসামরিক প্রশাসনের অপর কর্মকর্তারা। কমিশন উল্লেখ করে, 'প্রয়োজন সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালেককে (বাঙালি) সঙ্গত কারণেই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পাওয়া যায়নি।' আর মেজর জেনারেল রহিম যুদ্ধবন্দি না হওয়ায় তাকে আগে ও পরে দুই দফা জেরা করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার কথা থাকলেও নানা কারণে কমিশন উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। কমিশনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রথমে সে বছরের ১৫ নভেম্বর এবং পরে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেয়। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ২৫ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশন তার সম্পূরক রিপোর্ট পেশ করে।

সম্পূরক রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়, দ্বিতীয় দফায় অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করা হলেও মূল রিপোর্টে যেসব সিদ্ধান্ত ও উপসংহার টানা হয়েছে তা সংশোধনের কোনো প্রয়োজন দেখেনি কমিশন। বরং অতিরিক্ত তথ্যের মাধ্যমে আগের সিদ্ধান্তগুলোই সমর্থিত হওয়ায় মূল রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজনের প্রয়োজনেই সম্পূরক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনের এ সম্পূরক রিপোর্টই ফাঁস করে দিয়েছিল 'ইন্ডিয়া টুডে'। ভারতীয় এ সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন তুলেনি পাকিস্তান সরকার। প্রথম দিকে তারা বরং খতিয়ে দেখতে শুরু করে যে, রিপোর্টটি বাইরে গেলো কীভাবে। পাকিস্তানে সরকারিভাবে এ রিপোর্ট প্রকাশ করার পর সে দেশের সাংবাদিক ওয়াজউদ্দিন বিবিসিকে বলেন, ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত রিপোর্টের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের প্রকাশ করা রিপোর্টের সম্পূরক অংশের কোনো অমিল তিনি খুঁজে পাননি।

কমিশন নিয়েই নানা প্রশ্ন

হামুদুর রহমান কমিশন কোনো সত্যানুসন্ধান কমিশন ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পরপর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো 'যুদ্ধ তদন্ত কমিশন' নামে এ কমিশন গঠন করেন মূলত পরাজয়ের সামরিক দিক খতিয়ে দেখার জন্য। 'যে

পরিস্থিতিতে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার আত্মসমর্পন করেন, তার অধীনস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পন করেন এবং ভারতের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর অস্ত্রবিতরতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার' লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স বা কার্যপরিধিতে। এ থেকেই টের পাওয়া যায় কমিশনের সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়া কমিশনে যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পছন্দের লোকজনের প্রাধান্য ছিল সে নিয়ে পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায়ই নানা কথা ছাপা হয়েছে। কমিশনের প্রধান হামুদুর রহমানের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। বলা হয়েছে, সরকার পাকিস্তানে অবস্থানরত সব বাঙালিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও 'বাঙালি' হওয়া সত্ত্বেও বিচারপতি হামুদুর রহমানের বেলায় সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। তার এক ছেলে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর পদে নিয়োজিত ছিল, তাকেও বাংলাদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। এ সবের মধ্য দিয়েই সরকারের সঙ্গে হামুদুর রহমানের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। এছাড়া কমিশনের অন্যতম সদস্য বিচারপতি আনোয়ারুল হককে ১৯৭৪ সালেই পদোন্নতি দিয়ে সুপ্রিমকোর্টে নিয়োগ করা হয়। আর কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা দুজন সেনাকর্মকর্তার বিষয়টি তো রয়েছেই। এদের মধ্যে কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আলতাফ কাদির এক সময় ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব।

পাকিস্তানি সাংবাদিক এ টি চৌধুরী ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে 'ডন' পত্রিকায় এক নিবন্ধে বলেন, কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্সে প্রথমে শুধু 'পরাজয়ের সামরিক কারণ' উদঘাটনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও পরে হামুদুর রহমানের বিশেষ অনুরোধে সেই লক্ষ্য 'সামগ্রিক পরিস্থিতি' নিরূপণ পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। তবে বিচারপতি হামুদর রহমানকে তখন এই বলে সতর্কও করে দেওয়া হয় যে, তিনি যেন রাজনীতির আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে নিজের আঙুল নিজেই পুড়িয়ে না ফেলেন।

বিচারপতি হামুদুর রহমান এতোটা বোকা ছিলেন না যে, নিজের আঙুল নিজেই পোড়াতে যাবেন। আর সে কারণেই তার নেতৃত্বাধীন কমিশন পরাজয়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রসঙ্গ টেনে এনে তাকে অদূরদর্শী ও একগুঁয়ে হিসেবে চিহ্নিত করলেও একাত্তরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দায়-দায়িত্বও কেন্দ্রের সামরিক সরকারের ঘাড়েই চাপিয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তানের ভাঙনের' জন্য অর্থাৎ

পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের জন্য 'পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন, ব্যাপক দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কাপুরুষতা, এমনকি শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেও চারিত্রিক অধঃপতন'কে দায়ী করা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানসহ কতিপয় জেনারেলের নামোল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, তারা একে অপরের যোগসাজশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল এবং পূর্ব পাকিস্তানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে সেখানে ব্যাপক গণঅসন্তোষ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়, আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, পরিণামে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

ভুট্টোর কিছু সমালোচনা করা সত্ত্বেও এভাবেই তার আসল ভূমিকাকে আড়াল বা জায়েজ করার চেষ্টা করেছে কমিশন। তদন্ত চলাকালে ভুট্টোকে কখনোই কমিশনের সামনে হাজির হতে হয়নি। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল, পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংসতা, যুদ্ধের সময় কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা এবং যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য ইয়াহিয়াসহ ১৫ জেনারেলের বিচারের সুপারিশ করলেও কমিশন 'কসাই' নামে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খান এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের হোতা জেনারেল রাও ফরমান আলীকে রহস্যজনকভাবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কারণটা সম্ভবত এই যে, এ দুজনই ছিলেন ভুট্টোর একান্ত ঘনিষ্ঠ। ভুট্টো পরে টিক্কা খানকে সেনাপ্রধান বানিয়েছিলেন। ফরমানকেও নিয়োগ দিয়েছিলেন উচ্চপদে।

পরাজয়ের মূলে সেনাশাসন ও জেনারেলদের চারিত্রিক অধঃপতন!

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর পরাজয়—কমিশনের ভাষায় 'পাকিস্তান ভাঙা'র জন্য অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইনের বলে দেশ চালাতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা ও পেশাগত দক্ষতা নষ্ট করা এবং যুদ্ধের নয় মাস পাকবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন, লুটপাট, সামরিক শৃঙ্খলায় ভাঙন, ত্রুটিপূর্ণ সামরিক পরিকল্পনা, কাপুরুষতা, জেনারেলদের মধ্যেও চারিত্রিক অধঃপতন তথা 'মদ ও নারীর জন্য লালসা, অর্থ ও সম্পত্তির প্রতি লোভ', যুদ্ধে অনীহা প্রভৃতিকে দায়ী করা হয়েছে রিপোর্টে। পরাজয়ের কারণ হিসেবে রিপোর্টে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা বিশেষ করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর একগুঁয়েমির কথা উল্লেখ করা হলেও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, একাত্তরের পরিস্থিতির রাজনৈতিক দায়-দায়িত্বও কেন্দ্রের সামরিক সরকারের ওপরই বর্তায়।

কমিশন একাত্তরে 'পাকিস্তান ভাঙা'র জন্য তথা যুদ্ধে পাকবাহিনীর পরাজয়ের জন্য

মূলত পাকিস্তানের সেইসব শীর্ষস্থানীয় সেনাকর্মকর্তাকে দায়ী করেছে যারা সামরিক আইনের বলে দেশ শাসন করছিলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনারও দায়িত্বে ছিলেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস জি এম এম পীরজাদা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, মেজর জেনারেল উমর ও মেজর জেনারেল মিঠার নাম উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এরা একে অপরের যোগসাজশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল এবং পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে ব্যাপক গণঅসন্তোষ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়, আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, পরিণামে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ঘটে ও পাকিস্তান ভেঙে যায়।'

রিপোর্টে বলা হয়েছে, (এ জেনারেলরা) তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে নির্বাচনে (১৯৭০ সালের) বিশেষ ধরনের ফলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে হুমকি, প্ররোচনা এমনকি ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন এবং পরে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দিতে কোন কোন দল ও নির্বাচিত সদস্যকে প্ররোচিত করেছেন।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সামরিক আইনের বলে দেশ চালানোর দায়িত্ব থেকে উদ্ভূত দুর্নীতি, মদ ও নারীর প্রতি লালসা, জমি ও বাড়ির প্রতি লোভের কারণে শীর্ষস্থানীয় সদস্যরাসহ বিপুল সংখ্যক পদস্থ সামরিক কর্মকর্তার যুদ্ধ করার ইচ্ছাই শুধু লোপ পায়নি, তারা সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়ার পেশাগত যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছিলেন।'

কমিশন বলেছে, সেনাকর্মকর্তাদের চারিত্রিক অধঃপতন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যখন ঢাকায় প্রবেশ করছিল সেই সংকটময় মুহূর্তেও ঊর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তারা মদ ও নারী নিয়ে মত্ত ছিলেন এবং আরো নানা ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপেও লিপ্ত ছিলেন। এ ধরনের অপরাধের কিছু দৃষ্টান্তও রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।

কমিশন অভিযোগ পেয়েছে, যুদ্ধের সময় কেবল পূর্ব রণাঙ্গণ তথা বাংলাদেশেই নয়, পশ্চিম রণাঙ্গণেও সেনাকর্মকর্তারা নারী ও মদ কেলেংকারীতে জড়িত ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মকবুলপুর সেক্টরে ১১-১২ ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার হায়াতুল্লাহ তার অবস্থানের ওপর ভারতীয় গুলিবর্ষণের সময়ও বাঙ্কারে কয়েকজন মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করছিলেন।

চারিত্রিক অধঃপতন সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায় থেকেই শুরু হয়েছিল বলেও কমিশন

উল্লেখ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কমিশন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজিকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করেছে।

মাথায় পচন : ইয়াহিয়া নিজেই ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ, মদ্যপ ও লম্পট

রিপোর্টে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে দুর্নীতিপরায়ণ ও উদ্ধত্য প্রকৃতির লোক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, নারী সংসর্গ ও মদ্যপানে আসক্ত ইয়াহিয়ার এ স্বভাব শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদাধিকারী হওয়ায় ব্যক্তিগত জীবনযান সে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য ব্যক্তি ইয়াহিয়ার জীবনযাপন বিষয়ে কমিশন তদন্ত চালায়।

রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইয়াহিয়াকে যারা কাছে থেকে দেখেছেন তারা সবাই এক বাক্যে বলেছেন, ইয়াহিয়া ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মদ্যপ। প্রেসিডেন্ট পদটি দখল করার অনেক আগে থেকেই ইয়াহিয়া মদ পান করতেন এবং এটি ছিল তার জীবনযাপনের একটি বৈশিষ্ট্য। বেশ কয়েকজন সাক্ষী কমিশনকে বলেছেন, ইয়াহিয়া প্রচুর মদ খেতেন। অনেক সময় তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তবে কেউ তাকে কখনো মাতাল হতে দেখেনি, অতিরিক্ত মদ্যপানের পরও তার কোনো বিকার ঘটত না। মদ খাওয়াটা ইয়াহিয়া বেশ ভালোই রপ্ত করেছিলেন। কয়েকজন বলেছেন, মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে মাতাল না হলেও মাঝে মধ্যে তার কথাবার্তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যেত।

কমিশনের মতে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অতিরিক্ত মদ্যপান ইয়াহিয়ার চিন্তা ও বোধশক্তিতে প্রভাব ফেলেছিল। কমিশন বলেছে, যে-ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রধানের মতো দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্বের একক অধিকারী, একটি যুদ্ধকালসহ আরো অনেক বিষয়ে তার আরো বেশি সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

কমিশন বলেছে, মদ্যপান ব্যক্তিগত আচরণকে প্রভাবিত না করলেও এমনকি যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়েও ইয়াহিয়া দুবারের বেশি অপারেশন রুম পরিদর্শন করেননি। তবে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ইয়াহিয়ার সরকারি কাজকর্মকে ব্যাহত করেছে এমন দৃষ্টান্তও কমিশন খুঁজে পায়নি। তবে এ ধরনের বদভ্যাস মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে অবশ্যই ব্যাহত করে বলে কমিশন বিশ্বাস করে। রিপোর্টে বলা হয়, অনেক মহিলার সঙ্গে ইয়াহিয়ার অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে

প্রকাশ্যে জোর আলোচনা হয়। কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যেও তার সমর্থন মিলেছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইয়াহিয়ার যৌনজীবন ছিল একেবারে সংযমহীন। বহু মহিলার সঙ্গে ইয়াহিয়ার অবৈধ সম্পর্ক থাকাকে কমিশন দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বলেছে, এসব মহিলার মধ্যে একজন প্রেসিডেন্টের অতিথিশালায় অতিথি হিসেবে বাস করতেন। এক ঘটনায় দেখা গেছে, ইয়াহিয়াকে তার নিজ বাড়িতে পাওয়া গেল না। পরে তাকে ওই মহিলার বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায়। ওই ঘটনার কিছুদিন পর ওই মহিলা প্রেসিডেন্টের অতিথিশালায় নিজ বাসভবনের মতো বসবাস শুরু করেন।

রিপোর্টে হতাশা ব্যক্ত করে বলা হয়, ইয়াহিয়া সরকারি দায়িত্ব পালনের সময়ও ওই মহিলাকে আনুকূল্য দেখান। তিনি ওই মহিলা এবং তার স্বামী দুজনকেই বিদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। অন্যান্য মহিলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইয়াহিয়ার সুপারিশে তাদেরকে বিভিন্ন শিল্পের লাইসেন্স এবং বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের একটি অবৈধ সুপারিশ ঠিকমতো রক্ষা না করায় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। এ ধরনের মহিলাদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার অবৈধ সম্পর্ক সরকারি কাজকর্মে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করেছিল বলে কমিশন মনে করে।

রিপোর্টে দুইশ'র বেশি মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা নিয়মিত ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতেন। ইয়াহিয়া অধিকাংশ সময় এদের নিয়ে মদপান ও যৌনভচারে লিপ্ত হতেন। এদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আইজিপির স্ত্রী বেগম শামিম কে এন হোসেন, মুনাগড়ের বেগম, গায়িকা নূরজাহান, রাজা নামে এক নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী আকলিমা আখতার ওরফে জেনারেল রানী, করাচির এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী নাজলি বেগম, মিসেস মনসুর হিরজি, মে. জে. (অব.) লতিফ খানের সাবেক স্ত্রী জয়নাব, মালিক শেরে খিজির হায়াত খানের সাবেক স্ত্রী আরেক জয়নব, ঢাকার শিল্পপতি আনোয়ারা বেগম, ঢাকার মিসেস লিলি খান এবং রেডিও পাকিস্তানের বাংলা সংবাদ পাঠিকা লায়লা মোজাম্মেল উল্লেখযোগ্য।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের নভেম্বরে পরিস্থিতি যখন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছিল তখন ইয়াহিয়া লাহোরের গভর্নর হাউসে দুদিন অবস্থান করেন, সে সময় গায়িকা নূরজাহান ওই হাউসে প্রতিদিন দিনের বেলায় দুই থেকে তিনবার ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতেন এবং রাত ৮টা নাগাদ আরো একবার দেখা করতেন। কমিশনের মতে, অবাধ নারী-সংসর্গ ও মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান

ইয়াহিয়ার সরকারি কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করার কোনো উপযুক্ত প্রমাণ হয়তো পাওয়া যায়নি, তবে এ কথা সত্য যে, দেশের গুরুতর সঙ্কটের সময়ও তিনি তার এ বদভ্যাস দুটো ছারেননি।

ইয়াহিয়ার লম্পট্যের আরো দুই সাঙ্গাৎ

ইয়াহিয়ার নৈতিক অধঃপতন ও নারী ঘটিত কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, পাকিস্তানের দুভার্গ্য যে, ওই সময় কেবল প্রেসিডেন্ট নিজে নন, তার সাঙ্গপাঙ্গরাও সমানভাবে ব্যভিচারী ছিলেন। কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে দেখা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানও প্রায়ই ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন। ইয়াহিয়া ও হামিদ প্রায়ই গোপনে রাওয়ালপিন্ডির হারলে স্ট্রিটে ইয়াহিয়ার বাড়িতে তাদের কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে মিলিত হতেন।

রিপোর্টে আরেক সেনাকর্মকর্তা মেজর জেনারেল খোদাদাদ খানকে সব ধরনের নৈতিকতা বর্জিত পশু বলে আখ্যায়িত করা হয়। রিপোর্ট বলা হয়, ইয়াহিয়ার পতনের পর তার ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী বান্ধবী বলে পরিচিত আকলিমা আখতার ওরফে জেনারেল রানীকে তৎকালীন সরকার ডিটেনশন দেয় এবং ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে। রানী তার জবানবন্দিতে জেনারেল খোদাদাদ খানের বহু অপকর্মের বিবরণ দেন। খোদাদাদ সর্বশেষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রানী তার জবানবন্দিতে বলেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার পাশাপাশি জেনারেল খোদাদাদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের সুবাদে জেনারেল রানী সরকারের কাছ থেকে অনেক সুবিধা নেন। খোদাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা রানী সামরিক আদালতে দায়ের করা কয়েকটি মামলার কার্যক্রম বন্ধ করিয়েছিলেন। খোদাদাদের হস্তক্ষেপেই মামলার কাজ বন্ধ হয়েছিল। জেনারেল রানী বলেন, কয়েকটি ব্যবসায়িক লেনদেনেও খোদাদাদ আর্থিক সুবিধা নিয়েছিল।

নিয়াজির কুখ্যাতি বলে শেষ করার নয়

কমিশনের কাছে দেওয়া কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতে রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার আগেই নিয়াজি শিয়ালকোটের জিওসি এবং লাহোরের জিওসি ও সামরিক আইন প্রশাসক থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রচুর টাকা বানিয়েছিলেন। লাহোরের গুলবাগে সাঈদা বুখারি নামে এক মহিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ওই মহিলা 'সেনোরিতা হোম' নামের

আড়ালে একটি বাড়িতে পতিতালয় চালাত। জেনারেল নিয়াজির পক্ষে মহিলা ওই বাড়িতে বসে ঘুষ নিয়ে তবিরের কাজও করত। শিয়ালকোটেও তার একই কাজের জন্য শামিনি ফেরদৌস নামে আরেকজন মহিলা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজি নারী কেলেংকারীতে কুখ্যাতি অর্জন করেন। তার নৈশবিহারের জায়গাগুলোতে এমনকি জুনিয়র অফিসারদেরও যাতায়াত ছিল। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিমানযোগে পান পাচার করেও তিনি ব্যবসা করতেন। পিআইএ কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতেন ওজনে অবৈধ সুবিধা দিতে। আবদুল কাইয়ুম আরিফ (৯৬নং সাক্ষী), শিয়ালকোটের অ্যাডভোকেট মনোয়ার হোসেন (১৩ নং সাক্ষী), আব্দুল হাফিজ কারদার (২৫ নং সাক্ষী), মেজর সাজ্জাদুল হক (১৬৪ নং সাক্ষী), স্কোয়াড্রন লিডার সি এ ওয়াহিদ (৫৭ নং সাক্ষী) ও লে. কর্নেল হালিজ আহমদ (১৪৭ নং সাক্ষী) কমিশনের কাছে এসব অভিযোগ উত্থাপন করেন।

নিয়াজিসহ বন্দিরা ভারত থেকে ফিরে যাওয়ার পর আরো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সম্পূরক রিপোর্টে কমিশন মন্তব্য করেছে, 'আমাদের তদন্তের বর্তমান পর্যায়ে জেনারেল নিয়াজির যৌন অনাচার সংক্রান্ত কুখ্যাতি ও পান চোরাচালান সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর সব সাক্ষ্য প্রমাণ রেকর্ড করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নবম ডিভিশনের সাবেক জিএসও-১ লে. কর্নেল মনসুরুল হক (২৬০ নং সাক্ষী), পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার এ এ খান (২৬২ নং সাক্ষী), পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সাবেক কমান্ড্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডিয়ার আই আর শরিফ (২৬৯ নং সাক্ষী), ঢাকার সাবেক অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মোহাম্মদ আশরাফ (২৭৫ নং সাক্ষী) এবং লে. কর্নেল আজিজ আহমেদ খানের (১৪৭ নং সাক্ষী) সাক্ষ্য উল্লেখ করা যায়। শেষোক্ত সাক্ষীর মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ওই সাক্ষী বলেন, 'সৈন্যরা বলতো যে, কমান্ডার (লে. জে. নিয়াজি) নিজেই যখন ধর্ষণকারী তখন তাদের থামানো যাবে কীভাবে?'

মেজর জেনারেল কাজী আবদুল মজিদ খান (২৫৪ নং সাক্ষী) এবং মেজর জেনারেল ফরমান আলীও (২৮৪ নং সাক্ষী) জেনারেল নিয়াজির পান পাচার সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। মেজর এসএস হায়দার (২৫৯ নং সাক্ষী) ও ব্রিগেডিয়ার আতা মোহাম্মদের (২৫৭ নং সাক্ষী) সাক্ষ্য অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী পান চোরাচালানের কাজে জেনারেল নিয়াজির একজন সহযোগী ছিলেন।

নিয়াজি অবশ্য তার বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। নারী

কেলেঙ্কারির অভিযোগ সম্পর্কে তিনি কমিশনকে বলেন, 'আমি বলছি, না। আমি সামরিক শাসনের দায়িত্ব পালন করেছি। কেউ আমার কাছে দেখা করতে এলে আমি কখনো নিষেধ করিনি। পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগের সময় আমি খুব ধর্মভীরু হয়ে পড়ি। আগে আমি এমন ছিলাম না। এসব বিষয়ের চেয়ে মৃত্যুচিন্তাই তখন আমার কাছে প্রবল ছিল।'

কমিশন অবশ্য এসব অভিযোগ বিশ্বাস করেছে এবং পাকিস্তান সরকারকে আরো তদন্ত করে বিচার করতে বলেছে। সাক্ষ্য বিবেচনা করে কমিশন বলেছে, যৌন কেলেঙ্কারিতে জেনারেল নিয়াজি যে-কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর শিয়ালকোট, লাহোর ও পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজির যৌন কেলেঙ্কারির কুখ্যাতি একই রকম। পান চোরাচালানের অভিযোগও প্রতিষ্ঠিত।

কমিশন খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেও সামরিক শাসক ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানসহ শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলো খতিয়ে দেখেছে। কমিশনের রিপোর্টে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল হামিদ খান ও মেজর জেনারেল খোদাদাদ খানের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতা, মাতালামি ও দুর্নীতির অভিযোগগুলোর যথাযথ তদন্ত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কমিশন বলেছে, প্রাথমিক তথ্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত যে, নৈতিক অধঃপতনের জন্য তারা সিদ্ধান্তহীনতা, কাপুরুষতা ও পেশাগত অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশন ঊর্ধ্বতন সেনা কমান্ডারদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ জমির বরাদ্দ গ্রহণ এবং সরকারি তহবিলের অর্থ বিশেষ বিশেষ ব্যাংকে রেখে সেসব ব্যাংক থেকে অবিশ্বাস্য শিথিল শর্তে প্রচুর গৃহনির্মাণ ঋণ নেওয়ার অভিযোগগুলোরও তদন্ত করতে বলেছে।

নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা ও পরাজয়ের ভিত্তি রচিত ১৯৫৮ সালে

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'কমিশনের কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে নৈতিক অধঃপতনের ধারা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে সামরিক আইনে দেশ পরিচালনায় তাদের জড়িত হওয়ার সময় থেকে। এ প্রবণতা আবার দেখা দেয় ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারির সময় এবং এসব অভিযোগেরই বাস্তবিক সত্যতা রয়েছে যে, বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা শুধু ব্যাপকভাবে জমি, বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসা-

বাণিজ্যই হাতিয়ে নেননি বরং অত্যন্ত অনৈতিক ও লাম্পট্যপূর্ণ জীবন-যাপন করেছেন—যা তাদের পেশাগত দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলির মারাত্মক ক্ষতি করেছে।'

উল্লেখ্য, পাকিস্তানে এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার মুখে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক কর্মকর্তারা সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খানই বন্দুকের মুখে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে দিয়ে এ সামরিক শাসন জারি করান। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ২৪ অক্টোবর এক ঘোষণা বলে জেনারেল আইউব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইউব খান শপথ নিয়েই রাতের অন্ধকারে ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেন এবং একই সঙ্গে তাকে দেশ ত্যাগ করতেও বাধ্য করেন। আর আইউব খান নিজে ফিল্ড মার্শাল হয়ে ক্ষমতা দখল করে বসেন।

রিপোর্টে উল্লেখ আছে কিনা জানা না গেলেও আইউব খানের নিজের লেখা 'প্রভু নয় বন্ধু' বইটি থেকে সামরিক শাসন জারি প্রসঙ্গে অনেক কথা জানা যায় তার নিজের বয়ানেই। তিনি লিখেছেন, 'আমি বুঝেছিলাম যে, কোনো বাধা যদি আসে তবে সেটা হবে নামেমাত্র এবং দ্রুত আমরা তার মোকাবিলা করতে পারবো। অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন যে হবে সেটা মনেও করিনি।' তিনি বলেন, 'আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে খুব শিগগিরই উত্তাপটা কমে যায়। বৈদ্যুতিক বোতাম টিপলে যে রকম হয়, সামরিক আইন ঠিক তেমনিভাবেই এসেছিল। ...সে মুহূর্ত থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লো এবং বলতে কি তারা একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করলো।'

আইউব খান আরো জানান, ''আমার মনে হয়, তারা এটা বুঝেছিল যে, ইস্কান্দার মির্জার পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ...আমার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ইস্কান্দার মির্জাকে খুব খুশি দেখলাম না। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকবেন, কারণ সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা আপনার রক্ত চায়।' ...ইস্কান্দার মির্জা যেটা উপলব্ধি করতে পারেননি, সেটা হলো, তিনি যদি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কিছু করতে যান, তাহলে সেনাবাহিনী প্রথম যা করবে, সেটা হলো তাকে খতম করে ফেলা।'

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে (১৯৬২ সালে) আইউব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক শাসন চালু করলেও সে সময় দুর্নীতি আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায়।

আইউবের মৌলিক গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ওই সময় দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, দুর্নীতির ব্যাপারে সরকার শুধু চোখ-কান বন্ধ করেই থাকছে না, বরং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ইলেকটোরাল কলেজ গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে উৎসাহিতও করছে। ভোটাররা প্রকাশ্যেই তাদের ভোট বিক্রি করেছে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে।'

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইউব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে ফাতেমা জিন্নাহর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু এ নির্বাচনে জনগণের সরাসরি ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থার অধীনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল কেবল ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর। এরা হলেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদ সদস্য। আইয়ুবের ভয়ভীতি ও টাকা দিয়ে ভোট কেনার ফলে ফাতেমা জিন্নাহ সামান্য ভোটের ব্যবধানে আইউব খানের কাছে হেরে যান।

আইউবের শাসনামলে সেনাবাহিনীকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ফিল্ড মার্শালের নীতিই ছিল সেনাবাহিনীকে জমি-জমা দিয়ে, বেতন-ভাতা বাড়িয়ে এবং পেনশন সুবিধাসহ আরো নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তুষ্ট রাখা।'

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শরিফ (২৮৩নং সাক্ষী) কমিশনের কাছে তার সাক্ষ্যে বলেছেন, '১৯৫৮ সালে সশস্ত্র বাহিনী দেশের শাসনভার নেওয়ার সময়ই পরাজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ...এ নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারা রাজনৈতিক বৃত্তি আয়ত্ত করতে শুরু করার ফলে ক্রমান্বয়ে তাদের মৌলিক দায়িত্ব সেনাবৃত্তি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং নিজেদের জন্য তারা সম্পদ ও সৌভাগ্য লুটতে শুরু করে।'

সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে কমিশনও মত দিয়েছে, 'সামরিক শাসনের দায়িত্ব ও দেশের প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হওয়ার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অতিমাত্রায় দুর্নীতি পরায়ণতা, পেশাগত কাজে শৈথিল্য এবং নিজ নিজ ইউনিটকে দেওয়া অফিসারদের প্রশিক্ষণের মানে অবনতি ঘটেছে। কেননা বিভিন্ন কারণে তারা এসব দায়িত্ব পালনের সময় পাননি, অনেকে আগ্রহটুকুও হারিয়ে ফেলেন।'

পঁয়ষট্টির যুদ্ধই পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়েছে!

হামুদুর রহমান কমিশন একাত্তরের যুদ্ধে পাকবাহিনীর পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করার লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শুরু করলেও যুদ্ধ-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পটভূমি নিয়েও আলোচনা করেছে। তবে কমিশন এক্ষেত্রে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে আগ্রহ বোধ করেনি। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের অংশ থেকে এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, রিপোর্টের অপ্রকাশিত অংশেও এ ধরনের আলোচনা আদৌ ঠাঁই পায়নি। কেননা প্রকাশিত অংশেই কমিশনের যে মতামত পাওয়া গেছে তাতে স্পষ্টই তারা বলেছে, যুদ্ধে পরাজয় তথা 'পাকিস্তান ভাঙা'র ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে।

কমিশন এ বিষয়ে আরো একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এনে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, '১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের (পূর্ব পাকিস্তানিদের) বিচ্ছিন্ন হওয়ার মনোভাব সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের কোনো অভাব ছিল না। জাতি হিসেবে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের একমাত্র ক্ষোভ ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো সুযোগই তাদের ছিল না। খেমকরণের যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং বিমানবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি বৈমানিকরা তাদের দুঃসাহসী অভিযান ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমগ্র জাতির পরম শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।'

রিপোর্টে আরো বলা হয়, 'এ পর্যায় নাগাদ বিচ্ছিন্নতার কোনো প্রশ্ন ছিল না। জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিকই নিজ দেশকে রক্ষার জন্য সানন্দে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরই হতাশা গভীরতর হয়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানিরা উপলব্ধি করে যে, সঙ্কট-মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না বরং পূর্ব পাকিস্তানের আত্মরক্ষায় তার নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে।'

পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তথা বাঙালির মনে যে খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধের পর্যায় পর্যন্ত যে ঐক্য ও সংহতির কথা কমিশন উল্লেখ করেছে তাকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার কি কোনো কারণ আছে? ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পরই তো ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল। চল্লিশের দশকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, ১৯৫০ সালে খাপড়া ওয়ার্ডের ঘটনা, পরে সাম্প্রদায়িক সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে বাঙালির রুখে দাঁড়ানো, কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির

বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, ষাটের দশকের উত্তাল ছাত্র আন্দোলন—এসব ঘটনার প্রতি কমিশন চোখ-কান বুঁজে থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ খুশি হলেও বাঙালির পক্ষে তৃপ্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই।

দুই গভর্নর ও নিজের ছেলেরাই ডুবিয়েছে আইউবকে

আইউবি শাসনের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পেছনে যেসব ঘটনা কাজ করেছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে কমিশন আইউব খানের ছেলেদের কর্মকাণ্ড এবং পাকিস্তানের দুই অংশে দুই গভর্নরের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে। গভর্নর দু'জন হলেন পশ্চিম পাকিস্তানে কালাবাগের নওয়াব এবং পূর্ব পাকিস্তানে মোনায়েম খান। আইউব খানই এ দু'জনকে নিয়োগ করেছিলেন। এ দু'জন গভর্নরের কার্যকলাপ আইউব খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়তা করেছিল বলে হামুদুর রহমান কমিশন উল্লেখ করেছে।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, দুই গভর্নরের মধ্যে প্রথমজন গণতন্ত্রে বিশ্বাসই করতেন না। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে অতিমাত্রায় অজনপ্রিয় ব্যক্তি। এ দু'জন মিলে এমন নিষ্ঠুরভাবে শাসন কাজ চালাতে লাগলেন যে, ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের ভাবমূর্তি উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। গভর্নররা রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করেন, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন এবং এমনকি ছাপাখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেন। দেশে যে উত্তেজনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, এ দু'জনের কার্যকলাপ তা প্রশমনে কোনোভাবেই সহায়তা করেনি।

রিপোর্টে সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও বাঙালির জানা আছে যে, ১৯৬৪ সালে আইউববিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকলে শাসকচক্র অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা পরে তাই বিহারি-বাঙালি দাঙ্গায় রূপ নিলে এক পর্যায়ে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ দাঙ্গা থামাতে 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নেতৃত্বে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক সমন্বয়ে অচিরেই একটি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলা হয়। এ কমিটির উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে বিবেক-জাগানিয়া একটি প্রচারপত্র ছেপে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বিলি করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এ প্রচারপত্রের জন্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে বসেন।

ঠিক এরকম এক অবস্থায় মোনায়েম খান চ্যান্সেলর হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ছাত্ররা তার কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ছাত্র বিক্ষোভের মুখে মোনায়েম খান বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য

হন। আইউবের দোসর মোনায়েম খানের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত সারা শহরেই ছড়িয়ে পড়ে। পরে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তখন ৭৪টি কলেজ, ১ হাজার ৪০০ হাইস্কুল সরকার জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১ হজার ২০০ ছাত্রকে বহিস্কার করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। অনেককে জরিমানাও করা হয়। '৬৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২২ জুন পর্যন্ত সারাদেশে গড়ে প্রতি ৪২ ঘণ্টায় একজন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'আজাদ', 'সংবাদ' ও 'ইত্তেফাক' দেশের প্রধান ও তিনটি পত্রিকার প্রত্যেকটিকে আন্দোলনের খবর ছাপানোর কারণে জরিমানা করা হয় ৩০ হাজার টাকা করে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ পর্যায়ে গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে আইউব খানের ছেলেদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তারা কেবল দেশের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; নিজেদের জন্য অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতেও তারা তাদের অবস্থানকে কাজে লাগান। এক ছেলে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাবার পৃষ্ঠপোষকতায় একজন 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট'-এ পরিণত হওয়ার আকঙ্ক্ষাও পোষণ করতেন।

এছাড়া রিপোর্টে ওই সময়ে দেশে শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং তার ফলে সম্পদের অসম বণ্টনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, দেশের সম্পদ ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের হাতে জমা হতে থাকে। সাধারণভাবে অভিযোগ ওঠে যে, দেশের সব সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। এর ফলে স্পষ্টতই অনেক দ্রুতগতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষক হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন পশ্চিমীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রচারে এ বিষয়টিও গুরুত্ব পায় যে, ফিল্ড মার্শাল যে-সেনাবাহিনীর সহায়তায় দেশ শাসন করছিলেন সে বাহিনী মূলত পশ্চিমীদের নিয়েই গঠিত। রিপোর্টে এ অভিযোগের সত্যতাও স্বীকার করা হয়।

পরে আইউব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক শাসন চালু করলেও সে সময় দুর্নীতি আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই সময় দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। আর ফিল্ড মার্শালের নীতিই ছিল সেনাবাহিনীকে জমি দিয়ে, বেতন-ভাতা ও পেনশন সুবিধা বাড়িয়ে এবং অবসর গ্রহণের পর চাকরি প্রদানের আরো নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তুষ্ট রাখা। এসবের ফলেও জনমনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় বলে কমিশন মন্তব্য করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়, ফিল্ড মার্শালের সশস্ত্র বাহিনীকে তোষণের নীতিসহ এসব নানা বিষয় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিরোধীদল গঠন করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এবং দেশে সে সময় অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল। আর ১৯৬৭ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) গঠন করে ফিল্ড মার্শালের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক হলে দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। বিরোধী দলগুলো প্রথমেই সোচ্চার হয় দুই প্রদেশের গভর্নরদের জুলুম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে। দেশে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনে নামে। প্রধান চারটি দল মিলে ইউনাইটেড ন্যাশনাল কমান্ড নামে একটি জোট গঠন করে। ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপিপি এ কমান্ডে যোগ না দিলেও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের অধিকতর সুষম বণ্টনের দাবিতে দলটি পৃথকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। সরকার অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড় থাকে। ভুট্টোসহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার দেশে জরুরি অবস্থা বহাল রাখার পক্ষে প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয়।

এ অবস্থায় কালাবাগের নওয়াবের সঙ্গে আইউব খানের মতপার্থক্য বেড়ে যায়। ফলে নওয়াব পদত্যাগ করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর তৎকালীন কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল মুসাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আর জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে নিযুক্ত করা হয় সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা সিইনসি । মুসা বেশ ক'জন রাজবন্দিকে মুক্ত দেন এবং কোয়েটা ও কালাত ডিভিশনে মারি, বাগতি ও মেঙ্গল উপজাতীয় প্রধানদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাদের পরিবারের সর্দারি প্রথা ফিরিয়ে দিয়ে কিছু সমঝোতামূলক পদক্ষেপ নেন।

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানে মোনায়েম খান দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানকে সহিংস বিদ্রোহের মাধ্যমে পৃথক করে ফেলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত এ মামলার বিচার শুরু হয় ১৯৬৮ সালের জুন মাসে। এদিকে জেনারেল মুসার সমঝোতা প্রয়াস সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং সে বছর নভেম্বর মাসে আইনজীবী, চিকিৎসক, ছাত্রসহ সমাজের সকল স্তরের লোকজন রাস্তায় নেমে আসেন। তারা আইউব খানের পদত্যাগ দাবি করেন। সে সময় পেশোয়ারে এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গেলে ফিল্ড মার্শালকে লক্ষ্য করে গুলিও করা হয়।

এ ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ করা না হলেও বই-পুস্তক থেকে জানা যায়, ১৯৬৮ সালের ১০ নভেম্বর পেশোয়ারে এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় আইউব খানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে হাসিম উমর জাই নামে একজন

ছাত্র। অবশ্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় আইউব বেঁচে যান।

পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর হাসিম তার জবানবন্দিতে বলেছিল, দীর্ঘদিন ধরে দেশের জনগণের ওপর দমন-পীড়ন চালানোর কারণে আইউব খানকে খুন করতে না পারায় তার মনে দুঃখ রয়ে গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকার আন্দোলন দমন করার সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। অবশেষে রাজবন্দিদের মুক্তি এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দকে রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক) জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের শর্তসাপেক্ষে বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সম্মত হয়। তবে তারা আন্দোলনও চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। ভুট্টো তখনো কারাগারে। ১৭ ফেব্রুয়ারি তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ওই পর্যায়ে ডাক গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হলেও পিপলস পার্টি, আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ডাক তখন শেখ মুজিবকে বৈঠকে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানায়। শেখ মুজিব প্রথমে প্যারোলে মুক্তি পেতে রাজি হন। কিন্তু ততক্ষণে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়।। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামিকে এ অভিযোগে গুলি করে হত্যা করা হয় যে, তিনি কারাগার থেকে পালাতে চেয়েছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি তার লাশ আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হলে লাশ নিয়ে শোক মিছিল বের করা হয়। দলে দলে মানুষ ওই মিছিলে যোগ দেন। পূর্ব পাকিস্তানে ওইদিন ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। পুলিশ ঢাকা, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে গুলি চালালে ৯ জন মারা যান। আহত হন আরো ৫১ জন। শেখ মুজিব তখন মামলা প্রত্যাহার করা না হলে বৈঠকে যোগ দেবেন না বলে ঘোষণা দেন।

প্রকাশিত রিপোর্টে নিহত আসামির নাম উল্লেখ করা না হলেও প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আর সে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রীদের বাড়ি-ঘরে পর্যন্ত আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আইউব খান ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে জারি করা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে

সেদিনই শেখ মুজিব একজন মুক্ত মানুষ হয়ে যান। বিচারসংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করে নেওয়ায় জামিন বা খালাস দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর ফিল্ড মার্শাল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে রাজি হলে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি ভেঙে দেন, কিন্তু শেখ মুজিব নিজে থেকেই বিরোধীদলীয় ঐক্য থেকে সরে দাঁড়ান। তিনি যুক্তি দেখান যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ভাঙার দাবির প্রতি ডাক সমর্থন দেয়নি।

আইউব খান তার গভর্নরদের সরিয়ে নতুন করে গভর্নর নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে অবশ্য বিক্ষোভ চলতেই থাকে। রিপোর্টে বলা হয়, ১০ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে ঢাকায় ৩৯ জন লোক সহিংসতায় নিহত হন। ওই সময় অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অনেক ঘটনাও ঘটে। নয়া গভর্নররা উত্তেজনা কিছুটা প্রশমন করতে সক্ষম হন। আন্দোলনও কিছুটা ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইউব আকস্মিকভাবে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানেই আইউবের পতন

আইউব শাসনের শেষ দিকে উত্তেজনা কমে আসা এবং আন্দোলনও স্তিমিত হতে শুরু করার এ পর্যায়ে আইউব খানের আকস্মিক পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করা না হলেও রিপোর্টের অন্য অংশ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সেনাঅভ্যুত্থানের মুখেই আইউব ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন।

কমিশনের মতে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসজিএমএম পীরজাদা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিঠা একে অপরের যোগসাজশে দেশের সংবিধান লংঘন করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইউব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এভাবেই ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন এবং নতুন করে দেশে সামরিক আইন জারি করেন।

কমিশন উল্লেখ করেছে, ১৯৫৮ সালে আইউব খানের অভ্যুত্থানের পর সামরিক আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করার সময়ই পাকিস্তান সেনাবাহিনীরর জেনারেল ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সামরিক জান্তা সংবিধান উপেক্ষা করে ক্ষমতা দখলে রাখার সব ধরনের অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই জেনারেল ইয়াহিয়া

ও সাঙ্গপাঙ্গরা আইউবকে হটিয়ে দেশে সামরিক আইন জারি করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে কমিশন লক্ষ করেছে, বিদ্যমান পরিস্থিতি আঁচ করে প্রস্তুতি গ্রহণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান, তারপরে পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বানে গড়িমসি করা, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে আলোচনার নামে অর্থ ব্যয় এবং সর্বোপরি খসড়া সংবিধানে তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচির উল্লেখ থেকে এটা নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, ইয়াহিয়া সবসময় ক্ষমতা করায়ত্ত করে রাখার অপচেষ্টাই চালিয়ে গেছেন।

ইয়াহিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হীন উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে কমিশনের মূল রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতির পরও ইয়াহিয়া বলেছিলেন, এতে তার সাংবিধানিক পরিকল্পনায় এতটুকু পরিবর্তন হবে না এবং তিনি তার সময়সূচি ধরেই এগিয়ে যাবেন। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর পাকিস্তানে একটি নতুন সংবিধান জারি হবে বলেও তিনি ঘোষণা দেন। কমিশন বলেছে, ইয়াহিয়া তখন এক কল্পলোকের বাসিন্দা আর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

ইয়াহিয়া যে সংবিধানের কথা বলেছিলেন কমিশন তা পরীক্ষা করেছে। সংবিধানটির খসড়া কপিতে ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল: ক) এই সংবিধানের আওতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এইচপিকে এইচজে খ) সংবিধান চালু হওয়ার তারিখ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ হবেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এইচপিকে এইচজে, যার মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হবে না এবং গ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্বাচন হবে, ওই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশের কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ থেকে এই পদদুটো দখল করেছিলেন। পরে অবশ্য খসড়া সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি দ্রুত বাদ দিয়ে নতুন কপি প্রকাশ করা হয়।

কমিশন বলেছে, দেশের প্রেসিডেন্টের পদটি হাতে থাকলেও সংবিধানের বাইরে সামরিক আইন জারির জন্য কমান্ডার-ইন-চিফের পদটিও থাকা দরকার বলে ইয়াহিয়ার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, যাতে কেউ প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণ বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষমতা খর্ব করার সুযোগ না পায়।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ৬ দফার ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে '৬-দফা কর্মসূচি'র অপরিসীম গুরুত্বের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাধানো হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর পাকিস্তান তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাশখন্দ চুক্তি সই করে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে একটা আপোষ মিমাংসায় উপনীত হয়। তবে যুদ্ধের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা লাহোরে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি পেশ করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ৬-দফা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং শেখ মুজিবকে তারা পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। ৬-দফা তখন আওয়ামী লীগেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রক্ষণশীল প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতারাও ৬-দফা সহজে মেনে নিতে চাননি। কিন্তু আওয়ামী লীগের অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা-কর্মীরা একে 'বাঙালির মুক্তিসনদ' হিসেবে গ্রহণ করে নেন। সে বছর ৭ জুন ৬-দফা সমর্থনে আওয়ামী লীগ সারাদেশে হরতাল ডাকে। হরতাল চালাকালে মনু মিয়া নামের একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে তীব্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মধ্যদিয়ে ৬-দফাও জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। পরে দেশের ছাত্র সমাজ ৬-দফাকে একটি দফার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে ১১-দফা প্রণয়ন করলে আন্দোলনে ব্যাপক গতি সঞ্চার হয় এবং দ্রুত তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

আইউব শাহীর বিরুদ্ধে এ গণঅসন্তোষ ও গণআন্দোলনের বিবরণ হামুদুর রহমান কমিশনও রিপোর্টে নিজেদের মতো করে উল্লেখ করেছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। তার আগে ৬-দফা নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গটির প্রতি নজর দেওয়া যাক।

৬-দফা কর্মসূচি কোথা থেকে এসেছিল, কে তা প্রণয়ন করেছিলেন সে নিয়ে শুরু থেকেই নানা মত ও বিতর্ক ছিল। শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণা করার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপসমূহ এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। তাদের মতে, আসলে ৬-দফা প্রণয়ন করেছিল মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা সিআইএ। এর লক্ষ্য ছিল

আইউব খানকে বিপাকে ফেলে তাকে আরো বেশি করে কব্জায় নেওয়া। তবে ৬-দফার উৎপত্তি সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা পরে কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

অনেকে তখন মনে করেন, ৬-দফা আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালি সিএসপি অফিসার, রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান, আহমদ ফজলুর রহমান প্রমুখ রচনা করেন। এ মতেরই একটি অংশের ধারণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকসহ অপর বুদ্ধিজীবীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এটি।

একথা ঠিক যে, ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণার পটভূমিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবদান ছিল এক্ষেত্রে নিয়ামক। অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ড. মাহমুদ হোসেন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ প্রথম পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্যের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে দেশবাসীর সামনে এ মারাত্মক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন।

কোনো কোনো মহলের ধারণা, ৬-দফার প্রণেতা ভারতের একদল বামপন্থী। তারা সে সময় তা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাদের কাছ থেকে এটা যায় খায়রুল কবীরের (কৃষি ব্যাংকের সাবেক মহাব্যবস্থাপক) হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছে দেন।

একদল মনে করে, ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারক কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা যে সুপারিশ করেছিলেন, ৬-দফা ছিল তারই ভিত্তি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর ঢাকায় আইউব খানের ডাকা সর্বদলীয় সভায় পেশ করার জন্য প্রায় ৫০ জন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর যৌথ উদ্যোগে রচিত ৭-দফার অবিকল হচ্ছে ৬-দফা। এটা জনাব খায়রুল কবীরই রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে একটি মহল দাবি করে।

আরেকটি অংশ অবশ্য এ প্রচারণাও চালাত যে, রাজনৈতিক ফায়দা লুটার লক্ষ্যে আইউব খানই তার একান্ত ঘনিষ্ঠ আলতাফ গওহরকে দিয়ে ৬-দফা রচনা করান এবং তা খায়রুল কবীরের হাতে তুলে দেন।

হামুদুর রহমান কমিশনও একজন মাত্র সাক্ষীর বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষোক্ত প্রচারণাটিকে প্রাধান্য দিয়ে এ বিষয়ে একটি ফিরিস্তি তুলে ধরেছে।

কমিশন এমন একজন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেছে যিনি দাবি করেন যে, 'মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচি আসলে প্রণয়ন করেন আলতাফ গওহর। কিন্তু মার্শাল আইউব খানের নির্দেশেই আলতাফ গওহর কাজটি করেছিলেন।

আর এ ৬-দফার মধ্যে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভাঙার বীজ নিহিত ছিল।

সাক্ষ্যে বলা হয়, 'আইউব খান আসলে ১৯৬৬ সালে নওয়াবজাদ নসরুল্লাহ খান আহূত সর্বদলীয় সম্মেলন নস্যাৎ করা এবং বিরোধী দলগুলোতে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ বিরোধী দলগুলো তখন সামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে সমর্থন জোগাড় করতে শুরু করেছিল।

কমিশন অবশ্য স্বীকার করেছে যে, 'কীভাবে ৬-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল কিংবা কে তা প্রণয়ন করেছিল সে ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণে কিছুটা পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে। অধিকাংশেরই মত হচ্ছে, এ ৬-দফা প্রণয়ন করার মত প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের ছিল না।'

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারা যায় না, আর সেটি হলো, একজন রাজনীতিকের পক্ষে একটি জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়নে শুধু নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর না করে এ বিষয়ে প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের পরামর্শ নেওয়া কিংবা তাদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো কমিটিকে দিয়ে খসড়া তৈরি করিয়ে নেওয়াটা কি খুব দোষের? কোনো দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানও কি নিজেই তার দেশের সব মৌলনীতি নির্ধারণ করেন? আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এ কমিশনের রিপোর্টে এ ধরনের মন্তব্য তুলে ধরাটা অসমীচিন নয় কি?

কমিশন অবশ্য উল্লেখ করেছে যে, 'আলতাফ গওহর এ ঘটনায় তার কোন রকম হাত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। কমিশন বলেছেন, সাক্ষী রফিকুল হোসেন সম্মেলনের মাত্র কিছু সময় আগে বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। ওই সময় শেখ মুজিবুর রহমান কর্মসূচির একটি কপি ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। মানিক মিয়াও ছিলেন আওয়ামী লীগেরই একজন সদস্য।' এ বিষয়ে কমিশনের মন্তব্য এ রকম ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, আসল কথা হচ্ছে এ সম্মেলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই ৬-দফা অস্তিত্ব লাভ করে।'

কমিশন তার বিশেষ বিবেচনায় সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে তাহলো, ১৯৬৬ সালে ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোকে সুসংগঠিতভাবে সোচ্চার করে তোলার লক্ষ্যে লাহোরে একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। আর এ সম্মেলন আহবান করেছিলেন নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান। শেখ মুজিব এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহুল আলোচিত ৬-দফা কর্মসূচি এখানেই প্রথম ঘোষণা করা হয়।

হামুদুর রহমান কমিশন বলেছে, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, ১৯৬৬ সালের সম্মেলনের আগে ৬-দফার ধ্যান ধারণা অঙ্কুরিত হয়েছিল; আর এ বিষয়টিই

আমরা উল্লেখ করেছি।' কমিশন তার ভাষায় আরেকটি তথ্য উদঘাটন করেছে যে, সম্মেলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ৬-দফার একটি কপি পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা নূরুল আমিনের (পাকিস্তানের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট) কাছে পাঠানো হয়েছিল। নূরুল আমিন সেটা দেখান তার দলের আরেক সদস্য মাহমুদ আলীকে (প্রেসিডেন্টের সাবেক উপদেষ্টা এবং বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী) এবং উভয়ে একমত হন যে, এ ৬-দফার মধ্যে (পূর্ব পাকিস্তানের) বিচ্ছিন্ন হওয়ার বীজ নিহিত আছে যা কিনা তারা সমর্থন করতে পারেন না।

কমিশনের মতে, আমিন ও আলীর ধারণা ছিল, আমিন নিজেই কেবল ৬-দফার একটা কপি পেয়েছিলেন; কিন্তু এটা দেখে তারা অবাক হন যে, সম্মেলনে শেখ মুজিব সহসা সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে বসলেন এবং এ কর্মসূচির ভাষা মোটামুটি ঢাকায় তাকে দেখানো বা তার কাছে পাঠানো কপির অনুরূপ।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, শেখ মুজিবের ওই ঘোষণার ফলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আশু রেষারেষি শুরু হয়ে যায় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার প্রচেষ্টাই ভেস্তে যায়।

৬-দফার বিকৃত উপস্থাপন

হামুদুর রহমান কমিশন অবশ্য ৬-দফা কর্মসূচিও তুলে ধরেছে রিপোর্টে তবে বিকৃতভাবে। হামুদুর রহমান কমিশন ৬-দফা কর্মসূচির যে বিবরণ প্রকাশ করেছে তার ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রচারিত শেখ মুজিবুর রহমানের 'আমাদের বাঁচার দাবি, ৬-দফা কর্মসূচি'র বক্তব্যে একটি অমিল লক্ষ্য করা যায়। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে ৬-দফার কয়েক জায়গায় পাকিস্তানের দুই অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রচারপত্রে দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে 'পাকিস্তানের প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওই প্রচারপত্রে ষষ্ঠ দফাটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–'আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।'

ভুট্টো ছিলেন অদূরদর্শী, তার দাবিগুলোও ছিল অযৌক্তিক

রিপোর্টের সারাংশে বলা হয়েছে, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় পূর্ব পাকিস্তানে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপ) চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো তা অনুধাবন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে ভুট্টো যে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ছিল সে কথা আমরা (কমিশন) মনে না করে পারি না।'

কমিশন ঢাকায় পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিত করার ভুট্টোর দাবির পেছনে কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি। তেমনি অধিবেশনের আগে বঙ্গবন্ধুর কাছে ছয় দফার বিষয়ে ছাড় দিতে পিপিপির চাপকেও কমিশন সমর্থন করেনি।

কমিশন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয়ের জন্য প্রধানত সামরিক হাইকমান্ডকে দায়ী করলেও তখনকার পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ অন্য পাকিস্তানি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ভুট্টোর ভূমিকাকে আলাদাভাবে বিচার করে।

কমিশন বলেছে, সাধারণ নির্বাচনের সময় পিপিপি চেয়ারম্যান ভুট্টো আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির বিরোধিতা করেননি। কিন্তু পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বানের আগে বিষয়টি নিয়ে জনমত গঠনের নামে কালক্ষেপণের অবস্থান নেন।

ভুট্টো কোন গণতান্ত্রিক ও পার্লামেন্টারি নীতির ভিত্তিতে অধিবেশন শুরুর আগে ছয় দফার ব্যাপারে ছাড়া আদায় কিংবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের দাবি জানিয়েছিলেন তা কমিশন বুঝতে পারেনি। রিপোর্টে বলা হয়, ভুল-শুদ্ধ যাই হোক এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আওয়ামী লীগ ছয় দফার পক্ষে বাংলাদেশের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। তাই পার্লামেন্ট বা জাতীয় পরিষদে বিষয়টি উপস্থাপন বা আলোচনার আগে এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে কোনো রকম ছাড়ের ঘোষণা আশা করা যায় না। কমিশন মন্তব্য করেছে, তাই এটা পরিষ্কার যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের আগে আওয়ামী লীগের কাছে ছাড় ঘোষণার পিপিপি'র দাবিটি ছিল অযৌক্তিক। তেমনি অধিবশেন স্থগিত করার তাদের দাবির পেছনেও কোনো যুক্তি ছিল না। পিপিপি অধিবেশনে যোগ দিয়ে তাদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি হাউসে তুলে ধরলেই ঠিক কাজটি করা হতো।

পিপিপির তখনকার ভূমিকার বিষয়ে কমিশন বলেছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে বাংলার জনগণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তা সঠিকভাবে বোঝার মতো রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পিপিপি চেয়ারম্যান তখন দেননি। ভুট্টো নিজেও কমিশনের কাছে স্বীকার করেছিলেন, বাংলার জনগণের এতো তীব্র প্রতিক্রিয়া তিনি আশা করেননি।

হামুদুর রহমান কমিশন ওই সময়ের প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও পিপিপির রাজনৈতিক ভূমিকা বিশদভাবে খতিয়ে দেখেছে। পিপিপি তখন পাকিস্তানের 'দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ' দলের তত্ত্ব উত্থাপন করে ব্যাপকভিত্তিক কোয়ালিশনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল কমিশন তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, ফেডারেশন না হয়ে কনফেডারেশন হলে পিপিপির ওই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু ফেডারেল সরকার ব্যবস্থায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠনের অধিকার রাখে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্ষমতা ধরে রাখার মতো পর্যাপ্ত শক্তি না থাকলেই কেবল কোয়ালিশনের প্রশ্ন দেখা দেয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আলোচনায় কমিশন বলেছে, পাকিস্তান পার্লামেন্ট তথা জাতীয় পরিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনের জয়ী হয়। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে পিপিপি ৮৪টি আসন পেয়ে সেই অংশের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্থানলাভ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, দুদলের কেউই তাদের অঞ্চলের বাইরের কোনো আসনে জিততে পারেনি।

রিপোর্টে বলা হয়, নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ এবং বাংলার জনগণ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তারা আশা করেছিল, এই অধিবেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে যেখানে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এর পাশাপাশি তাদের মনে একটা শঙ্কাও বিরাজ করছিল যে, নির্বাচনে জয়ী হয়েও হয়তো তারা ক্ষমতায় যেতে পারবে না। বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে একপ্রকার সন্দেহের চোখে দেখেছে। তাদের আশঙ্কা ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে তা তারা সহজে ছাড়বে না।

রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এক বিশাল জনসভায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে জয়ী তার দলীয় সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। সেই অনুষ্ঠানে তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দলীয় কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। রিপোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিবের অবস্থান ধীরে ধীরে ছয় দফার পক্ষে অনড় হয়ে দাঁড়ায়। ছয় দফা বাংলাদেশের জনগণের সম্পদে পরিণত হয়। এ বিষয়ে কোনো প্রকার ছাড়া দেওয়া প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়ায়।

সত্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং '৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের জনসভার মাঝের সময়টুকুতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতাদের কোনোরকম আলোচনায় ডাকেননি। পরে শেখ মুজিব যখন কঠোর হয়ে উঠেছিলেন তখনই কেবল তিনি (ইয়াহিয়া) আলোচনার উদ্যোগ নেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে প্রায় সব দল এর আগে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিল। এ ক্ষেত্রে পিপিপির ব্যতিক্রমী ভূমিকাটি খুবই আমলযোগ্য। কেবল নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পরই

পিপিপিকে ছয় দফার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা গেল। অথচ অন্য দলগুলোর সমালোচনা তখন অনেক কমে যায়। কমিশন লক্ষ্য করেছে, পিপিপি চেয়ারম্যান দলের কোনো নির্বাচনী জনসভায়ই ছয় দফার বিরোধিতাকে ইস্যু করেননি বরং তার প্রচার তখন একটি সমাজবাদী কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তিনি ছয় দফার বিরোধিতা না করার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি তখন বলেছেন, জনসভায় ছয় দফার প্রভাব ব্যাখ্যা করার মতো সময় থাকতো না বলে অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো জমায়েতে তিনি নাকি বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ছয় দফা শুধু পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থিই নয়, এর মাধ্যমে দেশের অখণ্ডতাও বিনষ্ট হবে। রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, এমনই পটভূমিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তৎকালীনন পূর্ব পাকিস্তান সফরে যান এবং ১৯৭১ সালের ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ইয়াহিয়া মুজিবকে বলেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে ছয় দফার বিরুদ্ধে তার বলার কিছু নেই। তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে রাখতে মুজিবকে বলেছিলেন। জবাবে মুজিব নাকি বলেছিলেন, 'অবশ্যই, আগে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকুন। আমি ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি দেখবেন, পার্লামেন্টে আমি কেবল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব।'

কমিশনের মতে, মুজিবকে এ আশঙ্কা কথা বলা হয়েছিল যে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের তোয়াক্কা না করে সহজেই সংবিধান পাস করিয়ে নেবে। এর জবাবে মুজিব নাকি বলেছিলেন, 'না, না, আমি একজন গণতন্ত্রী এবং সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি কেবল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছে নয়, বিশ্ব জনমতের কাছেও দায়ী। আমি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির আওতায়ই সব কিছু করবো। আমি আশা করবো পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরুর তিন বা চারদিন আগে আপনি (ইয়াহিয়া খান) ঢাকায় আসবেন। তখন আমি আপনাকে খসড়া সংবিধান দেখাব। আপনি যদি এতে আপত্তিকর কিছু দেখেন, তাহলে আপনার ইচ্ছাকেও তাতে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করবো।'

কমিশন লক্ষ্য করেছে, মুজিবের এ আশ্বাসকে হালকাভাবে নিলেও বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ নেতা ছয় দফার ব্যাপারে অনড় থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার কথও চিন্তা করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার অর্থ বলতে কমিশন পশ্চিম পাকিস্তানের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই বুঝেছে যাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের কথাই বলা হয়েছে। এটি সেই ধরনের কেন্দ্রীয়

সরকার ব্যবস্থা যা যথেষ্ট শক্তিশালী না হলেও তার হাতে অনেক ক্ষমতাই থেকে যেত। কমিশনের মতে, ওই ধরনের কেন্দ্রীয় সরকার হলে পাকিস্তান একটি সত্যিকারের একক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারত।

রিপোর্টে বলা হয়, জেনারেল ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অভিপ্রায়ও নাকি ব্যক্ত করেছিলেন মুজিব; কিন্তু জবাবে ইয়াহিয়া নাকি বলেছিলেন, তিনি একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। তিনি আবার ব্যারাকে ফিরে যেতে চান অথবা অবসর জীবনে চলে যাবেন। ওই আলোচনায় ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল পিপিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আওয়ামী লীগের কাজ করার প্রাসঙ্গিকতাটি উল্লেখ করেন। মুজিব তখন অন্যান্য দলের মতো পিপিপির সহযোগিতাও চাইবেন বলে ইয়াহিয়াকে জানান।

শেখ মুজিব নাকি বলেছিলেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মতো একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা সে ধরনের কোনো কিছু করতে গেলে তিনি তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না। কমিশন বলেছে, পিপিপি তার সম্মতি ছাড়া কোনো সংবিধান প্রণীত হবে না বলে জোর দাবি জানিয়েছিল। কমিশন এ দাবিকে সমর্থন করেনি। ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণয়নে সম্মতির ক্ষেত্রে ফেডারেশনের প্রত্যেকটি ইউনিটের সমর্থন থাকতে হয়। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপি বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও কেবল দুটো ইউনিটেই দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল।

প্রকাশিত রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও সবারই জানা আছে যে, ১৯৭০ সালের ৭ এবং ১৭ ডিসেম্বর সমগ্র পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পর এটিই ছিল পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এর আগে ১৯৫৪ সালে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন হলেও সেটি হয়েছিল পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে। '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসল লাভ করে। অপরদিকে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ৮৩টি আসন। পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র একটি করে আসন লাভ করে পিডিপি এবং স্বতন্ত্র সদস্য। বাকি সব আসনেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক

পরিষদে একটি ছাড়া আওয়ামী লীগ সব আসনেই জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। একটি আসন পায় ন্যাপ (ওয়ালি)। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে পিপলস পার্টি, বেলুচিস্তান প্রদেশে ন্যাপ (ওয়ালি) ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (থানভি) কোয়ালিশন সরকার গঠনের মতো অবস্থায় পৌঁছে যায়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ বিরাট সাফল্য লাভের একদিন পরই পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের ক্ষমতায় হিস্যা দাবি করে বিবৃতি দেন। নানা টানাপোড়েন শেষে ১২ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ঢাকায় ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ওই ঘোষণার পর দিনই ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেন, তার দল ঢাকায় অধিবেশনে যোগ দেবে না। এ অধিবেশনের ব্যাপারে নানারকম হুমকিও দেন তিনি। পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনীতিকই তার এ ঘোষণার নিন্দা জানান এবং তাকে আগুন নিয়ে খেলা না করার পরামর্শও দেন। ভুট্টোর হুমকি অগ্রাহ্য করেই পিপিপি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যরা ঢাকায় আসতে থাকেন। ওয়ালি খান, জি এম সৈয়দ ও মাওলানা মুফতি মাহমুদের মতো নেতৃবৃন্দ এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে একাত্মতাও প্রকাশ করেন। কিন্তু ১ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর আবদার অনুযায়ী ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

হামুদুর রহমান কমিশন স্পষ্ট বলেছে, পিপলস পার্টি ও দলের চেয়ারম্যান যে কারণে ৩ মার্চের অধিবেশন যোগ না দেওয়ার অবস্থান নেন তা কমিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ যদি ৬-দফাকে নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে সামনে না আনতো তাহলেও একটা কথা ছিল। নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট লাভের পর এ বিষয়ে আওয়ামী লীগকে কোন আপোস করতে হলে সংসদে কিংবা সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আলোচনার সময় তা করাই যুক্তিসঙ্গত হতো। সংসদে পিপিপির যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও ৬-দফা কর্মসূচি কিংবা ভোট পদ্ধতির বিরুদ্ধে কেন গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো না তা কমিশনের বোধগম্য নয়।

এত কিছু সত্ত্বেও ভুট্টো নির্দোষ!

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় আশার বাণী শুনিয়েও পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে গড়িমসি করাসহ ওই সময় যেসব তৎপরতা চালিয়েছিলেন, হামুদুর রহমান কমিশন তার সঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর তখনকার তৎপরতার দারুন মিল লক্ষ্য করেছে। দুজনের ওই তৎপরতা যৌক্তিক ছিল না বলেও কমিশন উল্লেখ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিশন যাদের দোষী সাব্যস্ত করে বিচারের সুপারিশ করেছে তাদের মধ্যে ভুট্টোর নাম নেই।

১৯৭১ সালের ৭ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠক সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বৈঠকটি অবশ্য হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই হয়েছিল। পরদিন ঢাকা বিমানবন্দরে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে তার ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়েই এর জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়।

রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা ত্যাগের পর ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি ইয়াহিয়া করাচি যান এবং সেখান থেকে লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিযোগ রয়েছে, ওই সময় সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ জেনারেলের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয় এবং বৈঠকে নির্বাচনের ফল অনুযায়ী মুজিবকে ক্ষমতার নাগাল পেতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়। কমিশন ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর বৈঠকটিকে সেভাবে দেখেনি, কমিশনের কাছে ওই সময় ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকের মতো ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠকটিরও প্রয়োজন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ওই বৈঠকে ভুট্টো কিছু সময় চান মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। পাকিস্তানের অখণ্ডতা নষ্ট হবে না—এ শর্তে জনমত গঠন ও ছয় দফা বিষয়ে তার দলীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও সময় চান তিনি। ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের কোনো নির্দিষ্ট তারিখের প্রস্তাবও দিলেন না, তবে তিনি যথেষ্ট সময় চেয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে, মার্চের শেষ নাগাদ পার্লামেন্টে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। এর মধ্যে ভুট্টো ঢাকা সফর করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভুট্টো কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে বলেছেন, মুজিব নাকি তখন এক প্রকার কঠোর মনোভাব দেখান এবং ছয় দফা থেকে কোনো রকম সরে আসার সম্ভাবনা একেবারেই খারিজ করে দেন। কোনো যুক্তি পরামর্শই নাকি মুজিবকে প্রভাবিত করেনি। মুজিব তখন ১৫ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ কারণে

ভুট্টো নাকি ব্যর্থ মিশন শেষে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং এ কারণেই প্রকাশ্যে কিছু জানাননি।

এরপর ভুট্টো ১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মার্চের শেষ নাগাদ কোনো এক তারিখে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকার দাবি জানান। ইয়াহিয়া ৩ মার্চ তারিখটাই বেছে নিয়ে ওই তারিখে পার্লামেন্ট অধিবেশন হবে বলে ঘোষণা দেন।

ভুট্টো ঘোষণা দিলেন, তাদের কথা শোনা না হলে এবং যুক্তিসঙ্গত বিষয়গুলো আওয়ামী লীগ গ্রহণ না করলে পিপিপি ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগ দিতে যাবে না। ভুট্টো পরে কমিশনকে বলেছেন, ওই ঘোষণায় তিনি পার্লামেন্ট অধিবেশন বয়কট করার কথা বলেননি। চূড়ান্তভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো লাহোরে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তার দল যোগ দেবে না। শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো পার্লামেন্ট সদস্যকেও যোগ দিতে দেওয়া হবে না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের সদস্যদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, তাদের কেউ ঢাকায় গেলে যেন ওয়ানওয়ে টিকেট নিয়ে যায়। তাদের আর কোনো দিন পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরতে দেওয়া হবে না। তাদের 'পা ভেঙে দেওয়া হবে' এবং 'খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত আগুন জ্বলবে'।

কমিশন বলেছে, ভুট্টো সেই জনসভার একটি বিকল্প প্রস্তাবে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের বাধ্যবাধকতাটিও প্রত্যাহার করতে বলেন।

এরপর ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনিও পিপিপির সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দাবি করলেন, যে পার্লামেন্টে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সদস্যই উপস্থিত থাকছেন না তার অধিবেশন স্থগিত না করে আর উপায় নেই। রিপোর্টে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর তৎপরতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাঞ্জস্য থাকার কথা উল্লেখ করে কমিশন বলেছে, 'আমরা মনে করি সেটা যৌক্তিক ছিল না।'

এছাড়া ভুট্টো ২১ মার্চ ঢাকায় এসে কয়েকদিন ধরে আলোচনার আড়ালে সেনাবাহিনীকে চূড়ান্ত অভিযানে নামার সুযোগ করে দিয়ে ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে ঢাকা থেকে পালিয়ে করাচি পৌঁছে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আল্লাহর কাছে শোকরিয়া, পাকিস্তানকে বাঁচানো গেছে।' রিপোর্টের অন্য জায়গায় এ বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরও কমিশনের কাছে নির্দোষ রয়ে গেছেন

ভুট্টো! কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে, 'নির্বাচনের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছিল। অধিবেশন আহ্বানে বিলম্ব হওয়ায় সেখানে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান সংক্রান্ত ১৩ ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এ উত্তেজনা কমে আসে। কিন্তু অধিবেশন স্থগিত করে ১ মার্চের ঘোষণাটি সব কিছু ওলট-পালট করে দেয়।'

কমিশন বলেছে, অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বুঝে নেয়, নির্বাচনের ফল তারা যে আর ভোগ করতে পারবে না তারই চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে। কমিশন আরো বলেছে, 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী তলব করা হলো; কিন্তু কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।'

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এরপর ২৫ মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনী নাকি নিষ্ক্রিয় ছিল। ততোদিনে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য অন্য কোনো সরকারি এজেন্সির ওপর নির্ভর করার মতোও কোনো আশা রইলো না।

রিপোর্টে আরো দাবি করা হয়, বিক্ষোভ কেবল মিছিল ও সমাবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; লুটপাটের ঘটনা এসব কর্মসূচির এক স্থায়ী অংশে পরিণত হয়ে পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে, হামুদুর রহমান কমিশনের এ ধরনের দাবি ওই সময়ের কোনো বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের খবর থেকেই প্রমাণ করা যাবে না।

আলোচনাটা ছিল আসলে ইয়াহিয়ার ক্যামুফ্লেজ

হামুদুর রহমান কমিশন মনে করে, একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রতারণাই করেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার সামরিক উপদেষ্টারা। আলোচনায় কালক্ষেপণের আড়ালে তারা আসলে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালানোরই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্তরিক ইচ্ছা কখনোই পোষণ করেননি জেনারেল ইয়াহিয়া। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে ২৫ মার্চের কালরাতে ঢাকায় সেনা অভিযান শুরুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের আলোচনাটি ক্যামুফ্লেজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইয়াহিয়া ও তার সামরিক উপদেষ্টাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামী লীগকে কঠোর হাতে দমন করা।

মার্চে জেনারেল ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা

প্রসঙ্গে রিপোর্টে বলা হয়েছে, তখন আলোচনায় আওয়ামী লীগের পাঁচটি প্রস্তাব সামনে রাখা হয়। প্রস্তাবগুলো হচ্ছে–১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ২. পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ৩. আপাতত কেন্দ্রের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। ৪. জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দুই অংশের জন্য প্রাথমিকভাবে দুটো কমিটি হবে। ৫. এরপর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং দুই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী রচনা করা হবে সংবিধান।

কমিশন বলেছে, পিপিপির সম্মতি এবং সম্ভব হলে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থনের শর্তে ইয়াহিয়া এ প্রস্তাবগুলো মানতে রাজি ছিলেন। ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের ওই বৈঠকের পর ১৯ মার্চ ভুট্টোর কাছে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। বার্তায় বলা হয়েছিল, শেখ মুজিব তার সঙ্গে আলোচনা করতে চান এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ঢাকায় আসা উচিত। ২১ মার্চ ঢাকায় এসে ভুটো প্রথমে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পিপিপির কাছে এসব প্রস্তাবের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য হয়নি। দলটির মতে, জাতীয় পরিষদ সদস্যদের দুই ভাগে ভাগ করলে দেশ দ্বিখণ্ডিত না হলেও সেটা হবে কনফেডারেশনের ধারণাকেই নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া।

এর পরদিন মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া দু'জনেই পরে কমিশনের কাছে স্বীকার করেন যে, ওই সময় তাদের মধ্যে আসলে কোনো আলোচনাই হয়নি। ঢাকা বিমানবন্দরের বৈরী পরিস্থিতির জন্য মুজিব নাকি ভুট্টোর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ ভুট্টোকে তাদের অতিথি ঘোষণা করে তার সার্বিক নিরাপত্তার আয়োজন করেছিল। কমিশন বলেছে, ভুট্টো মুজিবের এ দুঃখ প্রকাশকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, ওটা তেমন কিছু নয়; বরং আগে একটি আপস নিষ্পত্তিই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার কাছে জানতে চান আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাবগুলো অনুমোদিত হয়েছে কি-না। তখন ইয়াহিয়ার মন্তব্য ছিল, এ ক্ষেত্রে ভুট্টোর সম্মতিও প্রয়োজন এবং এ জন্যই তাকে ঢাকায় ডাকা হয়েছে। শেখ মুজিবের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে ইয়াহিয়াই ভুট্টোকে রাজি করাবেন। কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শেখ মুজিব ও ভুট্টো ইয়াহিয়ার উপস্থিতিস্থলটি ত্যাগ করেন। ভুট্টোর সঙ্গে একা আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন মুজিব। তিনি ভুট্টোকে বলেছিলেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে গেছে এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য ভুট্টোর সাহায্য প্রয়োজন। কক্ষে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো রয়েছে আশঙ্কা করে দুই নেতা বারান্দা ধরে হেঁটে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সেলুন কক্ষের পেছনে পোর্টিকোতে গিয়ে বসেন। ইয়াহিয়া তার

কক্ষ থেকে দুজনকে দেখতে পাচ্ছিলেন।

কমিশন বলেছে, ওই সময় শেখ মুজিব দুটো কমিটি গঠনের ওপরই নাকি জোর দেন এবং যেহেতু একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে বলেন।

কমিশন বলেছে, ওই সময় ভুট্টো মন্তব্য করেছিলেন, অধিবেশন স্থগিত রেখে জাতীয় পরিষদের বাইরে আলোচনার আহ্বান তিনিই জানিয়েছিলেন। অথচ শেখ মুজিবই নাকি পরে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে ওই আলোচনার সময় ভুট্টো প্রস্তাবগুলো বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তিনি নাকি এ কথাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রস্তাবগুলোর চূড়ান্ত রূপ যা-ই হোক না কেন প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণার মাধ্যমে সেগুলো জারি করে জাতীয় পরিষদে তা একটি প্রস্তাব আকারে অবশ্যই পাস করিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেখ মুজিব নাকি অধিবেশন একেবারে এমনকি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও অনুষ্ঠান না করার ব্যাপারে অটল ছিলেন।

এদিকে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। খান ওয়ালী খান, মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াত খান, মৌলানা মুফতি মাহমুদ, মৌলানা শাহ মাহমুদ নুরানি প্রমুখ নেতার সঙ্গেও ইয়াহিয়ার আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ মুজিবের সঙ্গেও বৈঠক করেন। ওই নেতাদের সঙ্গে মুজিবের আলোচনার বিষয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা শেখ মুজিবের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখান এবং তার প্রস্তাবগুলোর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও তারা কোনো কনফেডারেশনের ধারণা বা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারেননি। ২৩ ও ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে। ওই সময় আওয়ামী লীগ আরো কঠোর অবস্থান নেয়। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, তখন কেবল দুটো কমিটি এবং আলাদা জাতীয় পরিষদই নয়; পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে দুটো সাংবিধানিক অধিবেশনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ওখানেই নাকি আওয়ামী লীগ সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে 'পাকিস্তান কনফেডারেশন' ধারণাটি তুলে ধরেছিল।

২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ বলেছিল, তাদের চূড়ান্ত অবস্থানের কথা ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আলোচনা করার মতো আর কিছু নেই। ২৪ ও ২৫ মার্চ ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে আওয়ামী লীগের দেওয়া প্রস্তাবগুলো নিয়ে

আলোচনা করেন। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগের দেওয়া চূড়ান্ত প্রস্তাবগুলো পিপিপি উপদেষ্টাদের জানান। ওই সময় চেষ্টা করেও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। বলা হয়েছিল, তিনি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ভোজসভায় আছেন। কমিশনের রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ইয়াহিয়া ততক্ষণে করাচির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। এরপর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শুরু হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওই জঘন্য হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়, পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের ওই নারকীয় সামরিক অভিযানের কোনো গোপনীয়তা কমিশনের কাছে ফাঁস করা হয়নি। এ রকম একটি হত্যাযজ্ঞ চলানোর কথা অনেক আগেই ভেবে রাখা হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তার প্রস্তুতি চলে। মধ্য মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আলোচনার পর্বটি ছিল পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের ছলচাতুরি মাত্র। ইয়াহিয়া ও তার সামরিক উপদেষ্টারা আওয়ামী লীগকে কঠোর হাতে দমন করার অভিপ্রায়টি অনেক আগে থেকেই পোষণ করে আসছিলেন। যদিও এ প্রসঙ্গে কমিশন তার রিপোর্টে একটি কল্পিত অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। কমিশন বলেছে, এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ২৫ মার্চের পর ২৬ মার্চ রাত ৩টা নাগাদ আওয়ামী লীগ নিজেই একটি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছিল। এ কারণেই জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ সন্ধ্যাকেই যে কোনো ধরনের একটি সমাধান অর্জনের শেষ সীমা ধরে নেন।

ওই সময় সামরিক অভিযান না চালিয়ে সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য নাকি ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আনার জোর চেষ্টা চলে। কমিশন বলেছে, জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ও অ্যাডমিরাল আহসান একটি সমাধানের জন্য ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আনার চেষ্টা চালান। তবে পরে দেখা যায়, অ্যাডমিরাল আহসানকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং পরামর্শ উপেক্ষিত হওয়ায় জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করেন। জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে টিক্কা খানকে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

কমিশনের মতে, যথেষ্ট তৎপর না হওয়ায় জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে টিক্কা খানকে নিয়োগ করেছিলেন ইয়াহিয়া। টিক্কাও নাকি ২৫ মার্চ পর্যন্ত জেনারেল ইয়াকুবের মতোই নমনীয় রয়ে যান।

সামরিক পরিকল্পনায় গলদ!

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণগুলোর মধ্যে সামরিক পরিকল্পনার ত্রুটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশন

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকেই 'মাথা মোটা' লোক আখ্যায়িত করে বলেছে, তার জন্যই দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কোনো সুফল বয়ে আনতে পারবে না জেনেও তিনি পাকিস্তানকে যুদ্ধে জড়ানোর মতো একটি মস্ত বড় ভুল পথে পরিচালিত করেন।

কমিশন বলেছে, লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজির প্রকৃত পদমর্যাদা নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তিনি থিয়েটার কমান্ডার ছিলেন, নাকি ছিলেন কেবল একজন কোর কমান্ডার সে নিয়েই মতবিরোধ। যদিও সরকারিভাবে তাকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার বলা হতো। জেনারেল নিয়াজি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় দাবি করেছেন, তখন তাকে সরকারিভাবে থিয়েটার কমান্ডার পদে নিয়োগ করা হয়নি এবং ওই ধরনের কমান্ডারের কোনো ক্ষমতা কিংবা দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। নিয়াজি কমিশনকে বলেন, 'আমি ছিলাম কোর কমান্ডার; পূর্ব পাকিস্তানের সব পাকিস্তানি সৈন্য আমার কমান্ডের অধীন ছিল। আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি বলা হতো। সব সেনা ইউনিট এবং বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনী আমার অধীনে ছিল। সৈন্যদের কমান্ড পরিচালনা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করাসহ অন্যান্য অপারেশনের জন্য আমি দায়ী ছিলাম। কিছু সময়ের জন্য সামরিক আইন বিষয়ে আমার করার কিছুই ছিল না। তেমনি ১৯৭১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম না। এরপর সামরিক আইন প্রশাসক হয়েও বেসামরিক প্রশাসনের ব্যাপারে আমার কিছুই করার ছিল না। সেখানে তখন গভর্নর ছিলেন, গভর্নরের মন্ত্রিসভাও ছিল। পুরোপুরি একটি বেসামরিক সরকার সেখানে কাজ করছিল।'

সম্পূরক রিপোর্টের ২৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, জেনারেল নিয়াজি কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন, অন্য ১০-১২ জন জেনারেলকে ডিঙিয়ে তাকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ পদাধিকারবলে তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ না হলেও চাকরিতে তার চেয়ে প্রবীণ ছিলেন। কমিশনের মতে, ওই সময় যারা নিয়াজিকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার নিয়োগ করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি সচেতন থাকা উচিত ছিল।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, তখন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা হওয়ার পুরোপুরি আশঙ্কা ছিল; কিন্তু সামরিক কমান্ড তা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জেনারেল নিয়াজির জারি করা ৩ নং অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশনে এটা পরিষ্কারভাবে বলা ছিল, প্রয়োজন মনে হলে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভারতের সঙ্গে একটি যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ জন্যে জিএইচকিউর (সেনা সদর দপ্তর) নির্দেশের

অধীন কেবল একজন কোর কমান্ডার থাকবেন। কমিশন মনে করে, একটি আলাদা যুদ্ধের পরিকল্পনার দায় না থাকা কিংবা নিজে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বলে যেসব দাবি নিয়াজি করেছেন, তা মেনে নেওয়া কষ্টকর। তবে নিয়াজি কমিশনের কাছে স্বীকার করেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেই রয়েছে বলে সেনাবাহিনীর পুরনো ধারণাটির পটভূমি বেশ দ্রুত বদলে গিয়েছিল। কারণ ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে প্রায় ৮ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছিল এবং আরো ৩ থেকে ৪টি ডিভিশন মোতায়েনের অপেক্ষায় ছিল। এরপর যথেষ্ট সৈন্য আর ভারতের হাতে থাকে না। আর তাই নিয়াজির ধারণা হয়েছিল, ভারত পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না। নিয়াজির মতে, পশ্চিম রণাঙ্গনে দুই পক্ষের শক্তির ভারসাম্য বজায় ছিল; আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি সেনা সদর দপ্তরকে অনুরোধ করেছিলেন, দয়া করে যুদ্ধ শুরু করবেন না। ভারত পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না এবং প্রকাশ্যে কোনো যুদ্ধও শুরু করবে না।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের পূর্বাংশে পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল; কিন্তু জেনারেল নিয়াজি ও তার ঊর্ধ্বতন কমান্ডাররা এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। ভারত কোনো যুদ্ধে জড়িত হবে না এবং অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে—এমন কিছু ভুল ধারণায় নাকি তখনো আচ্ছন্ন ছিলেন তারা।

কমিশন দুঃখভরে বলেছে, ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে সেনা সদর দপ্তর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফকে ভারতের পরিকল্পনার বিষয়টি জানানোর পরও নিয়াজি তার ধারণায় অবিচল ছিলেন। তিনি তখনো বলেছিলেন, 'আমি আবারো বলব যে তারা (ভারত) তাদের কামানের রেঞ্জের বাইরে পা ফেলবে না।'

কমিশন মনে করে, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ যখন অবধারিত হয়ে পড়েছিল তখন পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে পুরনো সমরনীতি অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে দৃঢ়তার সঙ্গে ও কার্যকর উপায়ে লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা উচিত ছিল। ইসলামাবাদের সর্বোচ্চ কমান্ড হাল ছেড়ে দিয়েছিল বলে নিয়াজি কমিশনের কাছে যে অভিযোগ করেন তাতেই তার ভুল ধারণাটি বেরিয়ে আসে। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে নেওয়া সাক্ষ্য বিচার করতে গিয়ে কমিশন বলেছে, প্রায় প্রতিটি প্রধান ইস্যুতে নিয়াজি এত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেন যে তাতে এটাই প্রমাণ হয়—নিজের দায়িত্ব কী এবং তা কীভাবে পালন করতে হবে তার কোনো পরিষ্কার ধারণাই তার ছিল না। কমিশনের মতে, সেনাবাহিনীর একজন জেনারেলের এ ধরনের আচরণ দুর্ভাগ্যজনক।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার পুরো বিবরণ আগেই

পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চতর কমান্ডও শত্রুপক্ষের এ হুমকির কোনো প্রকৃত মূল্যায়ন না করে বড় মাপের ভুল করে। এখন সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর দেখা যাচ্ছে, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডও দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই ধরনের ভুল ধারণা নিয়ে কাজ করেছে। কমিশন বলেছে, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডও মনে করেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ফ্রন্ট খুললেও কোনো অজুহাত না পেলে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রকার নগ্ন আগ্রাসন চালাবে না। আর এমন পরিস্থিতিতে মূল যুদ্ধ হবে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধের মধ্যেই রয়েছে—এই পুরনো ধারণাটিকে সঠিক মনে করেছিল পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড নাকি আরো মনে করত, পূর্ব পাকিস্তানে তাকে ভারতের সঙ্গে কোনো বড় ধরনের লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে না। তাদের এমন একটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে যাতে ভারত এই ফ্রন্ট থেকে সৈন্য সরিয়ে পশ্চিম ফ্রন্টে নিয়ে যেতে না পারে। আর এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ও অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ঢাকার প্রতিরক্ষাকে অবহেলা করেছিলেন। অথচ এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। কারণ এতে শত্রুপক্ষই সব সময় সুবিধা পেয়ে যায়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকা রক্ষার জন্য একটি এডহক ডিভিশন গঠন করা হয় এবং সেই ডিভিশনকে ঢাকা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩৬ এডহক ডিভিশন নামে পরিচিত এই সেনা দলটির কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ কমিশনের কাছে স্বীকার করেন, ঢাকায় 'বিদ্রোহমূলক তৎপরতা' প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সেখানে নিয়মিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনো প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। কারণ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ভেবেছিলেন অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোতে সেনা ইউনিট মোতায়েন করে শত্রুপক্ষের ঢাকা অভিমুখী 'ত্রিভুজ' বা ত্রিমুখী অভিযানকে বাধা দেওয়া যাবে। জেনারেল জামশেদ আরো জানান, যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো থেকে সেনা ইউনিট এনে ঢাকা রক্ষার কথা চিন্তা করা হয়নি। অবশ্য ততক্ষণে অনেক দেরিও হয়ে যায়। বিভিন্ন ফ্রন্টে পাকিস্তানি ইউনিটগুলোর পতন ঘটতে থাকে এবং সেই সঙ্গে দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে পরিস্থিতির।

জেনারেল রাও ফরমান আলী দাবি করেন, ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের পরও নাকি লড়াই চালানো যেত। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড আগেই যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। কমান্ড কমান্ডার ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতেন, যার দরুন ঢাকা ট্রায়াঙ্গেলের দিকে সৈন্য প্রত্যাহারের তার প্রতিটি পূর্বপরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর নাগাদ

কমান্ডারকে জানানো হয়েছিল যে, বড় হুমকিটি আসছে। কিন্তু তিনি তখনো কোনো ব্যবস্থা নেননি। কমিশনের মতে, কমান্ডার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন।

অন্যদিকে নিয়াজি কমিশনের সামনে দাবি করেন, বড় হুমকিটির ব্যাপারে জানার পর পরই তিনি ব্যবস্থা নেন এবং মেজর জেনারেল জামশেদের অধীনে একটি এডহক ডিভিশন গঠন করেন। কিন্তু মেজর জেনারেল জামশেদ কমিশনকে বলেন, মধ্য নভেম্বরে তিনি যখন সেনা সদর দপ্তরে যাচ্ছিলেন, এডহক ৩৬ ডিভিশনের কেবল একটি ব্রিগেডই তখন ঢাকায় মোতায়েন ছিল এবং আরেকটি ব্রিগেড গঠনের কথা সবে ভাবা হচ্ছিল, যাতে ঢাকা রক্ষার জন্য মোতায়েন করা আগের ব্রিগেডটিকে কিছুটা হলেও শক্তি জোগানো যায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফেরার পর তিনি দেখেন, বরং মোতায়েন করা ব্রিগেডটিকেও বাইরে পাঠানো হয়েছে। ফলে ষষ্ঠ ডিভিশন গঠনের বিষয়টি কেবল কাগজে কলমেই থেকে যায়। আর ময়মনসিংহে মোতায়েন করা ব্রিগেডটি ছিল ঢাকা থেকে ১০০ মাইল দূরে। কমিশনের মতে, এ থেকে বোঝা যায়, নিয়াজির দাবি পুরোপুরি অযৌক্তিক। কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, ভারতীয় হুমকির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক বিশ্লেষণ করলে কিংবা চিফ অব স্টাফ মারফত পাঠানো সেনা সদর দপ্তরের আগাম সতর্কবাণীকে গুরুত্ব দিলে নিয়াজি এত বড় ভুল করতেন না। নিয়াজি জানতেন যে, তার প্রতিপক্ষ ১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকেই রণসজ্জা শুরু করে। ভারত সীমান্তে ৮ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছিল। এছাড়া তিনটি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, দুটি অতিরিক্ত ব্রিগেড, একটি ছত্রী ব্রিগেড, বেশ কয়েকটি আর্টিলারি ব্রিগেড, ৩৫ ব্যাটালিয়ন সীমান্তরক্ষীও মোতায়েন করা হয়েছিল। এর বাইরেও ভারতের পক্ষে ছিল ১১ স্কোয়াড্রন বিমান, ২টি সাবমেরিন, ১টি বিমানবাহী জাহাজ এবং ট্যাংকের সমর্থন নিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নামানোর উপযোগী নৌযান, প্রায় ২৫-৩০টি টহল নৌযান, কয়েকটি ফ্রিগেট ও ডেস্ট্রয়ারও ছিল। আর ভারত যে তা কোনো ছায়াযুদ্ধে ব্যবহার করবে না তাও নিয়াজি জানতেন। এই বিশাল প্রস্তুতিকে অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, পাশাপাশি তা দায়িত্বে চরম অবহেলার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বটে।

কমিশন এরপর নিয়াজির পরিকল্পনার এই গুরুতর ত্রুটি ও ভুলগুলো শোধরানো সেনা সদর দপ্তর বা উচ্চতর কমান্ডের পক্ষে সম্ভব হতো কি না বা নিয়াজির পদে অধিকতর যোগ্য অন্য কোনো জেনারেলকে দায়িত্ব দেওয়া যেত কি না তাও যাচাই করে। কমিশন বলেছে, উচ্চতর কমান্ডের ধারণাও গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পরিকল্পনা তাদের

পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় তারা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেনা সদর দপ্তরের তথাকথিত জাঁদরেল জেনারেলরা হয়তো ভেবেছিলেন, পশ্চিম রণাঙ্গণে দুই পক্ষের শক্তির ভারসাম্য রয়েছে। তাই ভারতকে মোকাবেলা করার একটি সুযোগও আছে। আর এ সুযোগ ব্যবহার করতে গিয়ে বা দরকষাকষির সময় পূর্ব পাকিস্তান ছারখার হলে ক্ষতি কী। কমিশন সেনা সদর দপ্তরের এই অনৈতিক ধারণা উপলব্ধি করে বিস্ময় প্রকাশ এবং কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। আর এ কারণেই কমিশন সেনা সদর দপ্তরের তথাকথিত জাঁদরেল জেনারেলদের বিচারের সুপারিশ করে। কমিশন বলেছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ রকম একটি হীন মনোভাব নিয়ে এই জেনারেলরা তখন পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

পশ্চিম ফ্রন্ট খোলার পেছনেও তেমন কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি কমিশন। আর সেই ফ্রন্টেও পাকিস্তান ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার কারণ বাখ্যা করতে গিয়ে ইয়াহিয়া তার সাক্ষ্যে বলেন, এয়ার মার্শাল রহিম খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান বিমানবাহিনী প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। আর রহিম খান কমিশনকে জানান, তিনি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভাতিন্ডা পর্যন্ত স্থলবাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলোকে বিমান সহায়তা দিয়েছিলেন। তবে তার আরো সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতিটি স্থলবাহিনীর শর্তাধীন ছিল। তিনি আরো জানান, ওই সময় বিমানবাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরও স্থলবাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টের সির্সা নামে একটি এলাকা দখল করতে পারেনি।

এ দুই পক্ষের বক্তব্য যাচাইয়ের পর কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপ কমানোর জন্য পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলায় পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর অভিযান এবং পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তান বাহিনী পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করতে পারেনি যা নিয়ে পরে দর কষাকষি করা যেত।

কমিশনের মতে, প্রলোভন দেখিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে পাকিস্তানি ভূখণ্ডে এনে তাদের সরবরাহ বন্ধ ও ঘেরাও করে ফেলার যে রণকৌশল অনুসরণ করা হয় তা বরং উল্টো ফলই বয়ে আনে। এতে ভারতীয় বাহিনীর কোনো ইউনিটকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। বরং তারা পাকিস্তানের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ একটি বিরাট ভূখণ্ড দখল করে নেয়। কৌশলটি ভারতীয় বাহিনীকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানোর মতো হয়ে দাঁড়ায়। এ ফ্রন্টেও ইয়াহিয়ার সামরিক পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাত হেনেছিল।

সেনা সদর নাকি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়নি

একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদর দপ্তর থেকে কখনোই নাকি আত্মসমর্পণের কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এ দাবি করে হামুদুর রহমান কমিশন বলেছে, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার যে-নাজুক চিত্র সম্পর্কে সেনা সদর দপ্তরকে অবহিত করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে নিজের বিবেচনায় প্রয়োজন মনে করলে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়েছিলেন।

রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময়েও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির অধীনে ঢাকায় ২৬ হাজার ৪০০ সৈন্য ছিল। নিয়াজি নিজেই এ হিসাব দিয়েছেন। এ শক্তি নিয়ে তিনি আরো দুই সপ্তাহ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং ঢাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারতেন। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর আরো এক সপ্তাহ লাগত চারদিকে শক্তি সমাবেশ করতে এবং পরবর্তী সপ্তাহ লাগত ঢাকার দুর্গে ফাটল ধরাতে। কিন্তু ৭ ডিসেম্বর যশোর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতনের পর তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ ও সাহস হারিয়ে ফেলেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আমরা এ উপসংহারে পৌঁছেছি যে, আত্মসমর্পণের কোনো নির্দেশ ছিল না। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার পরিস্থিতির যে-নৈরাশ্যজনক চিত্র হাজির করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ মর্মে তাকে আত্মসমর্পণের অনুমতি দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি নিজের বিবেচনায় প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তা করতে পারেন। এ ধরনের নির্দেশনা জেনারেল নিয়াজি অবজ্ঞা করতে পারতেন যদি তিনি ভাবতেন যে, ঢাকা রক্ষা করার শক্তি তার রয়েছে। তার নিজের দেওয়া হিসাব অনুযায়ীই ঢাকায় তার হাতে ২৬ হাজার ৪০০ সৈন্য ছিল এবং তা দিয়ে আরো অন্তত দুই সপ্তাহ তিনি প্রতিরোধ করতে পারতেন।' রিপোর্টে আরো বলা হয়, 'জেনারেল নিয়াজি যদি তা করতেন এবং তাতে জীবনও হারাতেন তাহলে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারতেন এবং একজন মহান বীর ও শহীদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু পরিস্থিতি থেকে প্রমাণ হয়, ১৯৭১-এর ৭ ডিসেম্বর যশোর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পতনের পর তিনি লড়াই করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিহাস সৃষ্টি করাটা তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ছিল না।'

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় লে. জেনারেল নিয়াজির কমান্ডের অধীনে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ৭৩ থেকে ৯৩ হাজারের মতো সৈন্য ছিল। কিন্তু ৭ ডিসেম্বরের পর অবস্থা এমনি বেগতিক হয়ে দাঁড়ায় যে, জেনারেল নিয়াজিকে ওই সময়ের পর থেকে নিজের বাঙ্কারের বাইরে আর দেখা যায়নি।

কমিশন নিয়াজির আত্মসমর্পণকালে বিদ্যমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে।

কমিশনের কাছে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল তাতে দেখা গেছে, নিয়াজি অনির্দিষ্টকালের জন্য বা আশাতীতভাবে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন ভাবাটা অস্বাভাবিক। তবে তখন পর্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে যায়নি যে, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প ছিল না। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সবচেয়ে অগ্রবর্তী দলটি তখনো ঢাকা থেকে ১৬-১৭ মাইল দূরে ছিল। কমিশনের কাছে জমা পড়া সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায়, তখন ঢাকায় প্রায় ২৪ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ছিল এবং এটাও সত্য যে, এদের মধ্যে সবাই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার উপযুক্ত ছিল না। দেখা যায়, এদের মধ্যে সাড়ে ১৬ হাজার সৈন্য যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মতো উপযোগী ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখেও কমিশন প্রশ্ন করে, 'এরপরও কি তারা আরো কিছু সময় যুদ্ধ করতে পারত না? কেননা, এর আগেই তো জেনারেল নিয়াজি সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার লাশের ওপরই ঢাকার পতন হবে।'

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, রাওয়ালপিন্ডি থেকে জেনারেল নিয়াজির জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা কেবল নিয়াজির জন্যই ছিল। নির্দেশটিতে তাকে আত্মসর্পণ বিষয়ে অথরাইজেশন দেওয়া হয়েছিল বা নিদেনপক্ষে জেনারেল মানেকশর প্রস্তাবিত শর্ত গ্রহণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

কমিশন জোর দিয়ে বলেছে, নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশই নাকি দেওয়া হয়নি। তাই সে দিন নিয়াজি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার সব দায়দায়িত্ব কেবল একা তারই। এ দাবির ভিত্তিতে কমিশন বলেছে, নিয়াজি সেদিন আত্মসমর্পণ করতে নারাজ থাকলে পাকিস্তান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বেশ সুবিধাজনক কিছু ছাড় পেত। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় এড়ানো যেত।

আত্মসমর্পণের আগেও ইয়াহিয়া-নিয়াজির হম্বিতম্বি

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যুদ্ধের শেষ দুই মাসে পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের মধ্যে আদান-প্রদান করা ক্লাসিফায়েড সিগন্যালগুলো (গোপন বার্তা) থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রথমে হাঁকডাক এবং তারপর চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করবে—এমন প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত বাহিনী কীভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে যায়।

শীর্ষস্থানীয় সেনাকর্মকর্তাদের আত্মম্ভরিতা এবং বাইরের বৃহৎ শক্তির আনুকূল্য লাভের আশাও তাদের পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কট সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্যোগ না নিতে উৎসাহিত করে থাকতে পারে।

শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হতে

অনীহা, ব্যর্থতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার জন্য সামরিক কোটারিকে দায়ী করেছে হামুদুর রহমান কমিশনও। কমিশন বলেছে, ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পরও মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরগুলোতে তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেও এবং শেখ মুজিব ও ড. কামালের মতো দুজন শীর্ষ নেতা পাকিস্তানে থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো উদ্যোগ ইয়াহিয়া চক্র নেয়নি। বরং পূর্ব পাকিস্তানে উপনির্বাচনের মতো ব্যর্থ ও প্রহসনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরাজয়ের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে কমিশন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তৎপরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিও পর্যালোচনা করেছে। কমিশন লক্ষ্য করেছে, ১০ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। অবনতিশীল পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন সচিবরা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টকে কয়েকবার পরামর্শও দেন। কারণ সময়মতো সাহায্য না এলে কিংবা দেরিতে এলে তা কোনো কাজে লাগবে না। প্রেসিডেন্ট সচিবদের বলেছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, পাকিস্তান অবিলম্বে অস্ত্রবিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধিতা অবসানে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে বিরূপ ফলের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টের এ ধরনের বক্তব্য দেখেও কমিশন বিস্মিত হয়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১০ ডিসেম্বর রাশিয়া আশ্বাস রক্ষা করলেও তার দেওয়া শর্তগুলো পাকিস্তান পূরণ করতে পারত না। কারণ আত্মশ্লাঘার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো ধরনের রাজনৈতিক আলোচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এছাড়া তখন এটাও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল, জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ না করলে পাকিস্তানকে কেবল রাজনৈতিক আলোচনা নয়, মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী বন্দুকের নলের মুখে শিগগিরই রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হতো। কমিশন বলেছে, পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ নয়, তখনো ইয়াহিয়ার কাছে তার ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্যই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হম্বিতম্বি তখনো চলছিল।

কমিশনের মতে, তখনো ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোবল অটুট ছিল এবং তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। এছাড়া নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে অন্যদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও অনেক পাকিস্তানি সৈনিক নাকি তা মানেনি। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, অনেক

জায়গায় তখনো নাকি পাকিস্তানি সৈন্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সফলও হচ্ছিল। অনেকে আত্মসমর্পণ এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কমিশন আরো দাবি করেছে, সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী শীর্ষ কর্মকর্তার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকলেও অনেক পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা ও সৈনিক নিয়াজির নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

পরাজয়ের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে কমিশন বলেছে, নিয়াজি বলেছিলেন, তার লাশের ওপর দিয়েই মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ঢাকায় ঢুকবে। অথচ এ কথা বলার পরদিনই তিনি আত্মসমর্পণ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া বলেছিলেন, ওই আত্মসমর্পণ যুদ্ধের সার্বিক চিত্রের একটি দিক মাত্র, আর পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালু থাকবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইয়াহিয়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া একতরফা অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব মেনে নেন।

আত্মসমর্পণ: পরাজয়ের চেয়েও বেদনাদায়ক!

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকবাহিনী কোনো উস্কানি ছাড়াই ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটির ওপর বিমান হামলা চালানোর মাধ্যমে ভারতের সঙ্গেও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর ওই ঘটনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নতুন মোড় নিতে শুরু করে। পাকিস্তানি হামলার জবাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীও পরদিন থেকেই বাংলাদেশে পাকিস্তানি বিমান ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ওই সময় থেকে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় রণাঙ্গনে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধে। এদিকে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে এমনিতেই মুক্তিবাহিনী সারাদেশে একযোগে পাকবাহিনীর ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ জোরদার করে। ৬ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ শুরু করলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক পাকবাহিনীর ঘাঁটির পতন হতে থাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের একজন মুখপাত্র ৫ ডিসেম্বর মন্তব্য করেছিলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের অভিযানের সাফল্যের একটা বড় সুবিধা হলো যে, মুক্তিবাহিনী আগেই বহু এলাকা মুক্ত করে রেখেছে।'

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় রণাঙ্গনে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মনোবলহীন পাকবাহিনী কীভাবে একের পর এক রণাঙ্গন ছেড়ে দিয়েছিল, রিপোর্টে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে : 'সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার চতুর্থ দিনে গুরুশত্বপূর্ণ কিছু নগরদুর্গ বিনাযুদ্ধেই পরিত্যাগ করা হয়; যেমন পশ্চিম দিকে যশোর ও ঝিনাইদহ এবং পূর্বদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পরের দিন কুমিল্লা দুর্গ চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললে সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর ৯ ডিসেম্বর একজন ডিভিশনাল কমান্ডার সৈন্যদের ফেলে রেখেই তার

হেডকোয়ার্টারসহ কর্তব্য এলাকা ত্যাগ করেন। একই দিনে পরিত্যাগ করা হয় কুষ্টিয়া ও লাকসাম। লাকসামে এমনকি আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের ফেলে আসা হয়। ১৬ দিন যুদ্ধ করার পর ১০ ডিসেম্বর এমনকি হিলিও ছেড়ে আসতে হয়। ময়মনসিংহ থেকে পিছু হটা ব্রিগেডকে হেলিকপ্টারে করে নেমে আসা ভারতীয় সৈন্যরা ফাঁদে ফেলে এবং সৈন্যসহ ব্রিগেড কমান্ডার বন্দি হন।'

অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজি ওই দিন বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকায় মিত্রবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডার জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং বাংলাদেশের গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী নিয়াজির অধীনে ৯০ হাজারের বেশি পাকসেনা আত্মসমর্পণ করেছিল।

এ আত্মসমর্পণের ধরনটি কমিশনের মোটেই মনঃপূত হয়নি। কমিশন খুব দুঃখভরে বলেছে, 'জেনারেল নিয়াজির সামরিক পরাজয়ের চেয়েও বেদনাদায়ক হচ্ছে পাকিস্তান ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে চিরদিনের জন্য লজ্জায় ফেলে তিনি যে শোচনীয় কায়দায় ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর তথাকথিত যৌথ কমান্ডের কাছে অস্ত্র নামিয়ে রেখে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করতে, বিজয়ী ভারতীয় জেনারেল অরোরাকে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাতে, ভারতীয় জেনারেলকে গার্ড অব অনার দিতে এবং সবশেষে রেসকোর্সে জনসমক্ষে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে রাজি হন।'

কমিশনের মতে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইয়াহিয়া ও নিয়াজি দুজনেই ছিলেন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের নৈতিক বা পেশাগত কোনো মানই ছিল না। নিজেদের ব্যক্তিগত লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়েই তারা পাকিস্তানের ওপর এ বিশাল অপমানের বোঝা চাপিয়েছেন। ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঠিক আগের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে কমিশনের ধারণা হয়েছে, কেবল কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেলেই নাকি ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। কমিশন বলেছে, কী কারণে জেনারেল ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণ করার বিষয়টি অনুমোদন করেছিলেন বা নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তা খোঁজ করতে গেলে হতবাক হয়ে পড়তে হয়।

রিপোর্টে 'পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ' শীর্ষক একটি আলাদা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এ দুই জেনারেল যদি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সাহস দেখাতেন এবং আত্মসমর্পণ করতে রাজি না হতেন তাহলে 'মুসলমান সৈনিকদের' ইতিহাসে এই

নজিরবিহীন অপমানজনক ঘটনাটি ঘটত না।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, তখন নিউইয়র্ক থেকে নাকি ইয়াহিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তিনি যেন আরো কিছু সময় প্রতিরোধ চালিয়ে যান। আত্মসমর্পণের কেবল কয়েক সপ্তাহ আগে ইয়াহিয়া দাবি করেছিলেন, তিনি প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু পরাজয় যে অনিবার্য ছিল তা ইয়াহিয়ার মতো একজন অভিজ্ঞ জেনারেল কেন আঁচ করতে পারেননি তা দেখে কমিশন বিস্ময় প্রকাশ করেছে।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতাকে পুরোপুরি আড়াল করতে না পেরে কমিশন নানাভাবেই তাকে জায়েজ করার চেষ্টা করেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ও তার পরবর্তী সময়ে গৃহীত সামরিক পদক্ষেপকে 'শাস্তিমূলক ব্যবস্থা' হিসেবে উল্লেখ করে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, 'ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক বা সামরিক আইন প্রশাসনের প্রতি অনুগতদের হত্যা করছিল এবং লুটপাট চালাচ্ছিল।' রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির ওই বেদনাদায়ক অধ্যায়কে সঠিক প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।' এ 'সঠিক প্রেক্ষাপটের' ব্যাখ্যায় কমিশন বলেছে, 'এটা ভুললে চলবে না যে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ঘোষণা দেওয়ার পর আওয়ামী লীগই মাসব্যাপী সহিংসতা ও নৃশংসতা শুরু করেছিল। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৭১ সালের ১ থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারের কর্তৃত্ব অচল করে দিয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায়, ওই সময়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি, খুলনা, দিনাজপুর, গফরগাঁও, কুষ্টিয়া, ঈশ্বরদী, নোয়াখালী, সিলেট মৌলভী বাজার, রংপুর, সৈয়দপুর, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, নওগাঁ, সান্তাহার এবং আরো কয়েকটি ছোট শহরে পাকিস্তানপন্থীদের ব্যাপক হারে হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়েছে।' এ অভিযোগের সপক্ষে কমিশন মীর কুতুবউদ্দিন আজিজ নামে এক সাংবাদিকের লেখা 'ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার্স' গ্রন্থের বর্ণনা উল্লেখ করেছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, 'ওই সময় আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা ১ লাখ থেকে ৫ লাখ লোককে জবাই করেছিল।' বইটি বিহারিদের ওপর 'বাঙালি জঙ্গিদের' বিভৎস অত্যাচারের বিবরণে ঠাসা। কমিশনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তদন্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের দিকে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ১ লাখ থেকে ৫ লাখের বিশাল ব্যবধান সংবলিত একটি তথ্য কমিশনের বিবেচনায় নেওয়াটা। অথচ ২৫ মার্চ রাত পর্যন্ত ঢাকায় বিপুল

সংখ্যক বিদেশী সাংবাদিক অবস্থান করছিলেন। ওই সময়ে রাজপথ উত্থাল থাকলেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা ব্যাপক হারে বিহারি খুন করেছে বলে কোনো তথ্য তারা পাননি। সব বিদেশী সাংবাদিক নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন না।

সাংবাদিক কুতুবউদ্দিনের দেওয়া বেহিসাবি একটি তথ্য কমিশন বিবেচনায় নিলেও ২৫ মার্চ রাত থেকে পরবর্তী সময়ে পাকবাহিনীর বাঙালি নিধনযজ্ঞের যে সচিত্র বর্ণনা বিদেশি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিতে কমিশন দ্বিধাবোধ করেছে। অথচ কমিশনই বলেছে, সামরিক অভিযানের শুরুতে ২৬ মার্চ সকালে কর্তৃপক্ষ বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কর্তৃপক্ষ কোনো নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীকে প্রকৃত ঘটনা জানতে দিতে চান না। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদেশি পত্রপত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনযজ্ঞের ব্যাপারে উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করা হলেও পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কখনই হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

কমিশনের এ মন্তব্যের পরও কি বাঙালিদের হাতে ব্যাপক হারে বিহারি ও পাকিস্তান-সমর্থকদের হত্যার যুক্তি ধোপে টেকে? অথচ কমিশন আরো মত দিয়েছে যে, 'আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তদের অপকর্ম সৈন্যদের মনে ক্রোধ ও তিক্ততার জন্ম দেয়' এবং সে জন্যই 'সৈন্যরাও যেহেতু মানুষ' তাই তারা 'কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সহিংস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে'।

৩০ লাখ নয়, ২৬ হাজার!

একাত্তরে বাংলাদেশে বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ-নির্যাতন ও লুটতরাজের প্রকৃত চিত্র সযত্নে আড়াল করার চেষ্টা করেছে কমিশন। পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙালি হত্যা এবং এদেশের ২ লাখ নারীকে ধর্ষণের যে অভিযোগ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয় তাকে কমিশন অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের যেসব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোকেও বিবেচনায় নেয়নি কমিশন। এমনকি কমিশনের কাছে দেওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো কোনো কর্মকর্তার সাক্ষ্যও গুরুত্ব পায়নি। বাঙালি হত্যার বিভিন্ন সংখ্যা সম্পর্কে কমিশন তার রিপোর্টে বলেছে, 'কোনো বিস্তারিত যুক্তি ছাড়াই বলা যায় যে, এ সংখ্যাগুলো খুবই অতিরঞ্জিত। তখন পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে অন্য কোনো কাজ না করলেও তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে

এতখানি ক্ষতিসাধন করাই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনী অবিরাম মুক্তিবাহিনী, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও পরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।' এর বাইরেও বেসামরিক প্রশাসন চালানো, যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৭ কোটি লোককে খাওয়ানোর দায়িত্বও নাকি সেনাবাহিনীর ছিল বলে মন্তব্য করেছে কমিশন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, জেনারেল টিক্কা খান কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে ১৫ হাজারের মতো লোককে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে স্বীকার করলেও পরে একটি পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি এ সংখ্যা ৩০ হাজার হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। অপর এক সেনাকর্মকর্তা কমিশনকে বলেছেন, দলে দলে মানুষকে হত্যা করে সৈন্যরা। সংশ্লিষ্ট কমান্ডারদের তারা জানায়, একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করতে গেলে ওই লোকজন প্রতিরোধ করতে আসে এবং সে কারণেই নাকি তারা গুলি চালিয়েছে। কিন্তু পরে ওইসব মৃতদেহের কাছে গিয়েও কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় দালালদের দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক বানোয়াট তথ্য যাচাই না করেই তার ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর গোলার আগুনে ছারখার করে দেওয়া এবং ওইসব এলাকার নিরীহ নারী-শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষকে হত্যা করার অসংখ্য ঘটনার একটি উদাহরণ ঠাঁই পেয়েছে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীরই জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইয়ে। তিনি লিখেছেন, 'একদিন একজন দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক একটি তরুণকে সঙ্গে নিয়ে আসেন সামরিক আইন সদর দপ্তরে। বারান্দায় হঠাৎ করে তার সঙ্গে আমার দেখা। আস্থাভারে ফিসফিসিয়ে তিনি বললেন, বিদ্রোহীদের সম্পর্কে দারুন গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর আছে তার কাছে। আমি তাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন তরুণটি তার ভাইয়ের ছেলে। সে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড় কেরানীগঞ্জের বিদ্রোহীদের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে এসেছে। তরুণটি বললো, বিদ্রোহীরা শুধু স্থানীয় লোকজনকেই হয়রানি করছে না, রাতে ঢাকা শহর আক্রমণেরও পরিকল্পনা নিয়েছে। তৎক্ষণাৎ উচ্ছেদ অভিযানের আদেশ দেওয়া হয়। আক্রমণকারী সৈনিকদের কমান্ডারকে ব্রিফ করা হলো। ...গোলা বর্ষণের জন্য ফিল্ডগান, মর্টার ও রিকয়েলেস রাইফেল প্রস্তুত করা হলো। সকাল হওয়ার আগেই স্থানটি দখল করার জন্য সৈনিকরা সাঁড়াশি অভিযান চালাবে। আমি অপারেশন রুমে বসে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলাম। সেখান থেকে গোলা বর্ষণের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। অভিযানে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রও যুক্ত হয়। অনেকে এই ভেবে ভীত হলো যে, পরিবেশিত খবর অনুযায়ী

স্থানীয় ৫ হাজার বিদ্রোহীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হবে না আক্রমণকারী ব্যাটালিয়ন। সূর্যোদয়ের পরপরই অপারেশন শেষ হয়। নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, নিজেদের পক্ষে কোনো হতাহত ছাড়াই আমাদের সৈন্যরা লক্ষ্যকে শত্রুমুক্ত করেছে। যে অফিসার আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়, সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করলাম। সে যা বললো তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেলো। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সে বললো, ওখানে কোনো বিদ্রোহী ছিল না। ছিল না অস্ত্রও। শুধু গ্রামের গরিব লোকেরা যাদের বেশিরভাগই নারী ও বৃদ্ধ গোলার আগুনে পুড়ে দগ্ধ হয়েছে।'

হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের এসব বর্ণনাও কমিশনের মর্ম স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসেই পশ্চিম পাকিস্তানে জেনারেলদের এক কনফারেন্সে ইয়াহিয়া খান ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (সূত্র: রবার্ট পেইন, ম্যাসাকার, ১৯৭২, পৃষ্ঠা-৫০)। এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৩ জুন লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত অ্যান্টনি মাসকারেনহাসের Genocide : Full Report শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওই সময়েই পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে হিসাব দেন যে, উভয়পক্ষে আড়াই লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে অনাহারে ও মহামারিতে মৃতদের হিসাব ধরা হয়নি।

এ বিষয়ে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সংখ্যার কথা বললেও সেনাসদর দপ্তর থেকে দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তান বাহিনীর তৎপরতার সময় আনুমানিক ২৬ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল।' পূর্বাঞ্চল কমান্ড থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে পাঠানা রিপোর্ট থেকে হিসাব করে নাকি এ সংখ্যা বের করা হয়েছে। এ সংখ্যাও কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে বলে দাবি করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'কেননা নিম্নপদস্থ সেনাকর্মকর্তারা ওই সময় বিদ্রোহীদের দমনের ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব একটু বাড়িয়েও দেখিয়ে থাকতে পারে। যা হোক, অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অভাবে কমিশনের অভিমত হচ্ছে, সেনাসদর দপ্তরের দেওয়া সর্বশেষ সংখ্যা (২৬ হাজার) মেনে নেওয়াই উচিত হবে।'

কমিশন ২৬ হাজার লোক নিহত হওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে বললেও তার দৃষ্টিতে ভাল মানুষ মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীও ১৯৯৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়ে থাকতে পারে বলে স্বীকার করেন। এটিও প্রকৃত সংখ্যার ধারে কাছে নয়। তা সত্ত্বেও টিক্কা খান ও ফরমান আলীর দেওয়া তথ্যকেও মেনে নিতে অপারগতা কমিশনের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল। এছাড়া একজন সাক্ষী কমিশনকে এও বলেছে যে, মার্চ মাসে কেবল ঢাকায়ই সেনাবাহিনীর হাতে ৫০ হাজারের মতো লোক প্রাণ

হারায়। কমিশনের কাছে এ সাক্ষ্যও কোনো গুরুত্ব পায়নি। ওই সাক্ষীর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল রয়েছে রবার্ট পেইনের বর্ণনার। এ মার্কিন লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক কাছে থেকে। এ নিয়ে লেখা তার বই 'ম্যাসাকার'-এর ৪৮ নং পৃষ্ঠায় একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালি নিধন শুরুর দিনগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকার অর্ধেক মানুষ পালিয়ে গেল, আর হত্যা করা হলো কমপক্ষে ৩০ হাজার লোককে। চট্টগ্রামেও মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেককেই খুন করা হলো।' ঢাকায় পাকবাহিনীর ২৫ ও ২৬ মার্চের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার একই রকম চিত্র ফুটে উঠেছে একাত্তরের ৩০ মার্চ 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত সাইমন ড্রিংয়ের প্রথম প্রতিবেদনে। 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠাণ্ডা মাথায় টানা ২৪ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর ওই নগরীর ৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ...হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একসঙ্গে জড়ো করে মারা হয়েছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়িঘর, বাজার দোকানপাট।'

২৫ মার্চের কালরাতে ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট'-এ হতাহতের এসব সংখ্যাকে সঠিক বলে মেনে না নিলেও পাকিস্তানি বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক ওই রাতের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার বইয়ে তাতেও অভিযানের ভয়াবহতা ও বিভৎসতা আঁচ করা যায়। তিনি লিখেছেন, 'সেই রক্তাক্ত রাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–অগ্নিশিখা আকাশকে বিদ্ধ করছিল। এক সময় অগ্নিবর্ণের শোকার্ত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়িয়ে পড়লো, কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটাকে ছাপিয়ে উঠলো আগুনের লকলকে শিখা।' এ অভিযান সম্পর্কে পরদিন (২৬ মার্চ) দুপুরে ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের উপলব্ধি ও কিছু মন্তব্যও উল্লেখ করেছেন সিদ্দিক সালিক। তার বইয়ে একই অধ্যায়ের শেষভাগে উল্লেখ রয়েছে : ''কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বললেন, 'বাঙালিদের ভাল করে এবং ঠিকমতো বাছাই করা হয়েছে, অন্তত একটি বংশধরের জন্যতো বটেই'।''

এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই রাজধানী ঢাকায় বাঙালিদের 'ভাল করে বাছাই' করে অন্তত একটি প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইঙ্গিত পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তার বক্তব্যে ফুটে উঠলেও হামুদুর রহমান কমিশন সংখ্যার মারপ্যাঁচে ফেলে একে 'গণহত্যা' বলে মানতে নারাজ। অথচ পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতম মিত্র ও অস্ত্রের জোগানদাতা যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ কনস্যুলেট থেকে একাত্তরের ২৮ মার্চ ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে টেলিগ্রামে যে রিপোর্টটি পাঠানো হয়েছিল তার শিরোনামই ছিল 'বেছে বেছে গণহত্যা'। ঢাকায় সেই সময়কার মার্কিন

কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড ওই টেলিগ্রাম বার্তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেন।

হামুদুর রহমান কমিশন হত্যার যে-সংখ্যাকেই যৌক্তিক বলে মনে করুক না কেন, একাত্তরে বাংলাদেশে যে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ বিষয়ে যথেষ্ট দলিলপত্র রয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা ও কমপটন'স এনসাইক্লোপিডিয়াতেও ৩০ লাখ বাঙালি হত্যার কথাই উল্লেখ আছে। আর জে রুমেলের (R. J. Rummel) বইয়ে অবশ্য এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৫ লাখ। টাইম ম্যাগাজিনে ২৪ মে ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ওই সময় পর্যন্ত দুই লাখ বাঙালি নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একাত্তরের বধ্যভূমি চিহ্নিত ও উদ্ধার করার কাজে প্রায় দেড় যুগ ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি। কমিটির অনুসন্ধান মতে, এসব বধ্যভূমিতে নিহতের সংখ্যাই ১৮ লাখ হতে পারে। রবার্ট পেইন তার বইয়ে লিখেছেন, 'একটি জনগোষ্ঠীর সাড়ে চার শতাংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা–অবাক করে দেয় সভ্যতাকে। কিন্তু সৈন্যরা অবাক হয়নি, তারা আনন্দের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আদেশ পালন করেছিল। ৩০ লাখ বাঙালির রক্তে তারা নির্বিকারভাবে ভেজালো বাংলাদেশকে; কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো না।'

দুই লাখ নারী ধর্ষণের অভিযোগ নাকি অসাড়!

একাত্তরে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের এক ঘৃন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়ও রচনা করে বর্বর পাকহানাদার বাহিনী। বাঙালি নারীদের কখনো নিজ বাড়িতে, কখনো খেতে-খামারে, আবার কখনো সেনাক্যাম্পে ধরে নিয়ে তারা নির্যাতন ও ধর্ষণ করেছে। অনেক সময় স্থানীয় দালাল-রাজাকাররা নারীদের 'গণিমতের মাল' বলে ধরে নিয়ে তুলে দিয়েছে সেনাদের হাতে। আর সৈন্যরা ওই অসহায় বাঙালি নারীদের নিয়ে মেতে উঠেছে পৈশাচিক উল্লাসে। এসব লোমহর্ষক ঘটনার কথা সব বাঙালিরই জানা। এমনকি অজানা নয় তা বিশ্ববাসীরও। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাকর্তৃপক্ষের কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যেও এসব পৈশাচিকতার যে-সামান্য খবর প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের সংবাদ সংবাদমাধ্যমে তাতেই শিউরে উঠেছে বিবেকবান বিশ্ববাসী। নিউজ উইক সাময়িকীতে ২৮ জুন ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত 'দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয় : ''অন্য বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও প্রথমে পাকিস্তানিদের নৃশংসতা সম্পর্কে ছিলেন সন্দিহান। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে একের পর এক বিরামহীন নির্যাতনের কাহিনী শুনতে শুনতে পরে তারাও বিশ্বাস করেন ব্যাপারটা। ২০ বছর ধরে বাংলাদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ মিশনারি জন

হোস্টিংস বলেন, 'পাকিস্তানি সৈন্যরা যে শিশুদের শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বেয়নেটে গেঁথে গেঁথে হত্যা করেছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। নিশ্চিতভাবে আমি আরো বলতে পারি, সৈন্যরা মেয়েদের পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। তারপর দুই উরুর মাঝখানে বেয়নেট ঢুকিয়ে হত্যা করেছে তাদের'।" এর আগে ১৮ এপ্রিল লন্ডনের অবজারভার পত্রিকার খবরে বলা হয়, 'এখন অবশ্য রাজধানীতে যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা অন্ধকারে খুন, লুট ও ধর্ষণ করার উদ্দেশে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকতে শুরু করেছে।' টাইম ম্যাগাজিনের ২১ জুন সংখ্যায় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে বেনাপোল সীমান্তের ওপারে পেট্রোপোল ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া এক তরুণীর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়। তরুণীটি টাইম ম্যাগাজিনকে বলেন, 'বাবা-মার সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলাম। ঘরের বাইরে বুটের আওয়াজ শুনতে পাই। দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে কয়েকজন সৈন্য। আমাদের তিনজনের দিকেই বেয়নেট তাক করে রাখে। আমার চোখের সামনে রাইফেলের বাট দিয়ে পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলে মা আর বাবাকে। মেঝের ওপর ফেলে তিন সেনা মিলে ধর্ষণ করে আমাকে।' ত্রিপুরার এক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া আরেক বাঙালি তরুণীর অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা হয় টাইম ম্যাগাজিনের ওই প্রতিবেদনে। ওই তরুণী জানান, পালিয়ে আসার আগে তাকে ১৩ জন পাকিস্তানি সেনা পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে জেনারেল রাও ফরমান আলীও বলেছেন, 'ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও অপমানজনক আচরণের ভয়াবহ বিবরণ সাধারণভাবে শোনা গেছে।' কমিশনও যুদ্ধে পরাজয়ের যেসব কারণ চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে আছে 'জেনারেলদের মধ্যেও চারিত্রিক অধঃপতন তথা মদ ও নারীর জন্য লালসা, অর্থ ও সম্পত্তির প্রতি লোভ' প্রভৃতি। কমিশন মন্তব্য করেছে, সেনা কর্মকর্তাদের চারিত্রিক অধঃপতন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যখন ঢাকায় প্রবেশ করছিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তেও উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা মদ ও নারী নিয়ে মত্ত ছিলেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে খোদ জেনারেল নিয়াজিই নারী কেলেঙ্কারিতে কুখ্যাতি অর্জন করেন বলে উল্লেখ করে কমিশন জানিয়েছে, 'তার (নিয়াজির) নৈশ বিহারের জায়গাগুলোতে এমনকি জুনিয়র অফিসারদেরও যাতায়াত ছিল।'

একটি বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের চরিত্রই যদি এমন হয় তাহলে অধঃস্তনদের অবস্থাটা কী হতে পারে সে কথা বলাই বাহুল্য। কমিশনের কাছে অন্য সেনাকর্মকর্তাদের দেওয়া সাক্ষ্য থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। লেফটেন্যান্ট

কর্নেল আজিজ আহমেদ খান কমিশনকে জানান, 'সৈন্যরা বলতো যে, কমান্ডার (নিয়াজি) নিজেই যখন ধর্ষক তখন তাদের থামানো যাবে কীভাবে?' কিন্তু এতোসব সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও কমিশন এ জঘন্য অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ২ লাখ বাঙালি নারী ধর্ষিত হয়েছিল বলে শেখ মুজিবুর রহমান যে অভিযোগ করেন তার অসাড়তা ধরা পড়ে যখন ১৯৭২ সালের শুরুতে তিনি ব্রিটেন থেকে গর্ভপাতের জন্য চিকিৎসক দল নেন এবং সেই চিকিৎসকদের কেবল একশর কিছু বেশি মহিলার গর্ভপাত করাতে হয়।'

শুধু বিদেশী ডাক্তারদের কাছে গিয়ে গর্ভপাত করানোর কাল্পনিক সংখ্যা তুলে ধরে এমন জঘন্য অপরাধকে আড়াল করার চেষ্টা রীতিমত হাস্যকর। অথচ ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আসা অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড. জিওফ্রে ডেভিসের মতে, কেবল নির্যাতিত অন্তঃসত্ত্বা নারীর সংখ্যাই দুই লাখ। মোট নির্যাতিতার সংখ্যা চার লাখ থেকে চার লাখ ৩০ হাজার। সুইডেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনেও একাত্তরে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা প্রায় চার লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক ড. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই দেড় লাখ থেকে এক লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করিয়েছেন। এদের বেশিরভাগই গর্ভপাত ঘটিয়েছেন স্থানীয় ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে। এভাবে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেকে মারাও গেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজেদের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাহাত্তরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত যেসব মহিলা আত্মহত্যা করেন তাদের আত্মীয়-স্বজন আত্মহত্যার খবরটি চেপে রেখেছেন, পাছে মামলা-মোকদ্দমার ঝক্কি পোহাতে হয় এই ভয়ে।

একজন অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞের পক্ষে এসব তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হলেও হামুদুর রহমান কমিশন তা করতে পারেনি বা পারার চেষ্টাই করেনি। কোনো নারী ধর্ষণের শিকার হলেই গর্ভধারণ করেন না—এ সহজ সত্যটি কমিশনের উপলব্ধিতে আসেনি। আর পাকসেনাদের হাতে ধর্ষিত হয়ে কত বাঙালি নারী একাত্তরেই আত্মহত্যা করেছেন এবং কতজনকে ধর্ষণের পর সেনারাই নৃশংসভাবে মেরে ফেলেছে সে হিসাবও কমিশন খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি।

একথা ঠিক যে, ১৯৭২ সালে সরকারিভাবে বীরঙ্গনার সংখ্যা দুই লাখ বলে যে হিসাব তুলে ধরা হয় সেটি ছিল অনেকটা অনুমান নির্ভর। তাই বলে মনগড়া ছিল

না সেই হিসাব। যুদ্ধের নয় মাসে তৎকালীন ৪৮০টি থানা থেকে প্রতিদিন গড়ে দু'জন করে বাঙালি নারীকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল—এরকম অনুমানের ভিত্তিতে সে হিসাব বের করা হয়। কিন্তু পরবর্তী বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে, ওই হিসাবটি বরং অনেকটা কমিয়েই করা হয়েছিল। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালব্ধ তথ্য এবং অস্ট্রেলীয় বিশেষজ্ঞ ডেভিসের পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করে। এ বিষয়ে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা চালিয়েছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি। ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে ২০০২ সালের মে মাস পর্যন্ত দেশের ৪২টি জেলার ৮৫টি থানার প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন কমিটির কর্মীরা। এতে বেরিয়ে এসেছে একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের নারী নির্যাতনের ধরণ, নির্যাতিতার সংখ্যা এবং নির্যাতন-পরবর্তী নানা সমস্যার তথ্য। কমিটির আহ্বায়ক ডা. এম. এ. হাসান এক নিবন্ধে লিখেছেন, স্পট ধর্ষণ ও স্পট গণধর্ষণেই দেশের প্রায় তিন লাখ ২৭ হাজার ৬০০ নারী নির্যাতিত হয়েছেন। এ সংখ্যা মোট নির্যাতিতার ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ নারীকে (এক লাখ ৪০ হাজার ৪০০) পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের ক্যাম্পে, বাঙ্কারে, মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে এবং জেলখানা, স্কুল-কলেজ, পরিত্যক্ত অফিস কারখানা, গোডাউন প্রভৃতি স্থানে বন্দি রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ করেছে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির গবেষণা অনুযায়ী নির্যাতিত ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬৮ হাজার। এ হিসাবের সঙ্গে সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. জিওফ্রে ডেভিসের দেওয়া হিসাবের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কোনো কোনো হিসাবে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। অথচ হামদুর রহমান কমিশন দুই লাখ নারী নির্যাতনের অভিযোগকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে বলে রায় দেওয়া নাকি সম্ভব নয়

সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের এ দেশীয় দোসর আল-বদর ও আল-শামস বাহিনীর গুপ্তঘাতকরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল দেশের কৃতিসন্তান বুদ্ধিজীবীদের। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষ দিকে বাঙালি জাতি যখন আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত, ঠিক সে মুহূর্তেই রাতের অন্ধকারে বাঙালির মেধা ও মননকে ধ্বংস করার জঘন্য তৎপরতায় মেতে ওঠে গুপ্তঘাতকরা। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর রাতে কেবল ঢাকা শহরেই ঘাতকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক,

সংস্কৃতিসেবীসহ প্রায় দেড়শ বুদ্ধিজীবী ও শীর্ষস্থানীয় পেশাজীবীকে অপহরণ করে রায়েরবাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।

গুম-খুনের শিকার শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. মোহাম্মদ মোর্তুজা, অধ্যাপক রাশিদুল হাসান, ড. সন্তোষ ভট্টাচার্য, ডা. মোহাম্মদ শফি, সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, নিজামউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার আবু তালেব, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, নাজমুল হক, আলতাফ মাহমুদ, ড. আবুল খায়ের, ড. সিরাজুল হক খান, ড. ফয়জুল মহী, ডা. আলীম চৌধুরী প্রমুখ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি নিখোঁজ হন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। আর ফিরে পাওয়া যায়নি তাকে।

জাতির জাগ্রত বিবেক বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে জাতিকে চিরকালের জন্য মেধাহীন ও পঙ্গু করে দেয়ার অশুভ লক্ষ্যেই ঘাতকেরা এ কাজ করেছিল। একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার পাকবাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নিধনযজ্ঞ শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যার মধ্য দিয়ে। পরে দেশব্যাপী গণহত্যার পাশাপাশি কৃতি ও মেধাবী বাঙালি হত্যার কাজ অব্যাহত রাখলেও নিজেদের পরাজয় অনিবার্য জেনে হানাদার বাহিনী ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা করতে থাকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন বেসামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করেন। সেই নীলনকশা বাস্তবায়নে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরি করে দেয় স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী। চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়ে ১৩ ডিসেম্বর রাতের আঁধারে বাছাই করা বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কাজটি সমাধা করেছিল জামায়াতে ইসলামী এবং তার ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে গঠিত আল-বদর ও আল-শামস নামে দুটি কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট গ্রুপ। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার জন্যই মূলত পাকবাহিনী এ দুটি ঘাতক বাহিনী গড়ে তুলেছিল। ঘাতকরা সেদিন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বেছে বেছে ধরে নিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। অনেকের লাশ গুম করে ফেলা হয়। রায়ের বাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশের স্তূপ দেখে মানুষ হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাকবাহিনী ও তার দোসররা পরাজয়ের আগ মুহূর্তে সারা দেশে সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অথচ হামুদুর রহমান কমিশন এ বিষয়ে কোনো তথ্যই খুঁজে পায়নি। হয়তো ইচ্ছে করেই কমিশন বিষয়টি হাল্কাভাবে নিয়েছে। এ সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয় যখন দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অভিযোগ অনেকটা খণ্ডন করার লক্ষেই কমিশন এ বিষয়ে কিছু সাক্ষ্য তুলে ধরে। ১৯৭৪ সালের ২৮ জুন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফরে এলে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধকালীন কিছু প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর (ভুট্টোর) সঙ্গে আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিষয় বিশেষভাবে উত্থাপন করেন। এ সূত্র ধরে কমিশন বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী কমিশনকে জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৯ বা ১০ তারিখ সন্ধ্যায় ঢাকা বিভাগের উপ-সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জামশেদ তাকে ফোন করে পিলখানায় তার সদর দপ্তরে যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে জেনারেল ফরমান অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। জে. জামশেদ একটি গাড়িতে উঠতে উঠতে তাকেও সঙ্গে যেতে বলেন। তারা দুজনেই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দপ্তরে লে. জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। পথে জেনারেল জামশেদ জেনারেল ফরমান আলীকে জানান, তারা কিছু লোককে গ্রেপ্তার করার কথা ভাবছেন। জেনারেল ফরমান আলী নাকি তা না করার জন্যই পরামর্শ দেন। তারা জেনারেল নিয়াজির দপ্তরে পৌঁছার পর জেনারেল ফরমান আলী তার পরামর্শের কথা আবার বলেন। নিয়াজি ও জামশেদ উভয়েই তখন চুপ করে থাকেন। জেনারেল ফরমান আলী জানান, এরপর কি ঘটেছে তা তিনি জানেন না। তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তবে তিনি মনে করেন, আর কিছু করা হয়নি।

এ বিষয়ে কমিশনের প্রশ্নের জবাবে জেনারেল নিয়াজি বলেছেন, স্থানীয় কমান্ডাররা ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর তার কাছে একটি তালিকা নিয়ে আসে। তাতে দুষ্কৃতকারী ও মুক্তিবাহিনী প্রধানদের নাম ছিল; কিন্তু কোনো বুদ্ধিজীবীর নাম ছিল না। ওই তালিকা অনুযায়ী কাউকে তুলে আনতে বা গ্রেপ্তার করতে তিনি নিষেধ করেন। ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর বা তারপরে কোনো বুদ্ধিজীবী গ্রেপ্তার বা নিহত হয়েছেন মর্মে অভিযোগ নিয়াজি অস্বীকার করেন।

রিপোর্টে বলা হয়, 'মেজর জেনারেল জামশেদ অবশ্য একটু অন্যরকম ভাষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৯ বা ১০ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি

ঢাকায় জনগণের একটি অভ্যুত্থান হতে পারে বলে নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা শাখার মতো বিভিন্ন সংস্থার কাছে থাকা তালিকা অনুযায়ী কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এক সভায় বিভিন্ন সংস্থা গ্রেপ্তারের তালিকা হাজির করে এবং তাতে ২ থেকে ৩ হাজার লোকের নাম উল্লেখ ছিল।' জেনারেল জামশেদের মতে, সে সময় এতো লোককে গ্রেপ্তার করা হলে তাদের রাখার জায়গা, প্রহরা, পালানোর আশঙ্কা, ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ হলে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের অযোগ্য মনে হওয়ায় তিনি জেনারেল নিয়াজির কাছে এ পরিকল্পনা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি জানান, এরপর এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

কমিশন বলেছে, 'বিষয়টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে প্রতীয়মান তিন জেনারেলের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের শেষ দিকে ঢাকায় একটি গণঅভ্যুত্থানের আশঙ্কা রোধ করার জন্য আওয়ামী লীগ বা মুক্তিবাহিনীর নেতা হিসেবে পরিচিত লোকদের গ্রেপ্তার করার কথা আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ অবস্থা ও আসন্ন আত্মসমর্পনের সম্ভাবনার মুখে এ বিষয়ে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা (কমিশন) মনে করি, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কোনো সন্দেহাতীত প্রমাণ হাজির না করলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে কোনো বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবীকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করেছে বলে রায় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

বিস্তর অজুহাতসহ সাতটি অভিযোগ

হামুদুর রহমান কমিশন বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯ মাস জুড়ে জঘন্য গণহত্যা ও লাখ লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি এবং শেষ পর্যায়ে সুপরিকল্পিত নীলনকশার মাধ্যমে দেশের বরণীয় বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করে হত্যার অপরাধ আড়াল করার পাশাপাশি যেটুকু নৃশংসতার চিত্র মোটেই লুকোতে পারেনি তার পেছনে নানা অজুহাত দাঁড় করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কমিশনের মতে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে শুরু হওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম অভিযান (গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ) ছিল কেবল 'সামরিক অভিযান' এবং আইনের দিক থেকে কঠোরভাবে বিচার করলে তা ছিল 'বেসামরিক প্রশাসনকে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তা' প্রদান মাত্র। কমিশনের আরো যুক্তি হচ্ছে, এই নির্মম তাণ্ডবকে 'একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখতে হবে, যা পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্য' নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ হামুদুর রহমান কমিশনও ছিল ইয়াহিয়া ও তার দোসরদের মতো সমান বাঙালি-বিদ্বেষী। দেশের

নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধিরাই যে সরকার গঠন করবে তা এই কমিশনও মানতে পারেনি। উল্টো পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনাকেই অনুমোদন করেছে।

কিন্তু তারপরও কমিশন তার রিপোর্টে স্বীকার করেছে, বিভিন্ন স্থানে সামরিক অভিযান চালানো ও পাইকারি হারে জোরজবরদস্তির ঘটনায় বাংলার জনগণ পাকিস্তানবিরোধী হয়ে যায়। কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিয়াজি টিক্কা খানের ঘাড়ে দোষ চাপান। নিয়াজি বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে টিক্কা খান 'পাইকারি হারে জোরজবরদস্তি'র ঘটনা ঘটান, যার কারণে বাংলার জনগণ পাকিস্তানবিরোধী হয়ে যায়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা প্রণয়নকারী ও আলবদর বাহিনীর পৃষ্ঠপোষক জেনারেল রাও ফরমান আলীও বলেছিলেন যে, স্থানীয় জনগণ নাকি 'বাড়িবাড়ি পর্যায়ের অতিরিক্ত হয়রানি'র শিকার হয়। এছাড়া দায়িত্বে নিয়োজিত লোকজনের নাকি 'অবনতিশীল মানসিকতা' ছিল। তৎকালীন গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা ফরমান আলী কমিশনের সামনে দাবি করেন, তিনি নাকি পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যদের জন্য একটি 'ভাল আচরণের' দিক-নির্দেশিকা প্রণয়ন করেন এবং 'সাধারণ জনগণের মন জয় করার জন্য' ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন। তিনি দাবি করেন, গভর্নর টিক্কা খান নাকি তার 'সুপারিশ' আমলে নেননি এবং সুপারিশটি উপেক্ষিত থেকে যায়।

কমিশনের রিপোর্টে পাক বাহিনীর লুটতরাজের পক্ষেও কিছু খোঁড়া যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর 'সশস্ত্র আওয়ামী বিদ্রোহীদের' মোকাবিলার জন্য সৈন্যদের যখন সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয় তখন তাদের উপযুক্ত সরঞ্জাম ও রসদ দেয়া হয়নি। সৈন্যরা খাদ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিত। দোকানপাট ভেঙে তারা জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে; কিন্তু কোন তালিকা রাখেনি। কমিশনের মতে, যানবাহন, খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতির প্রয়োজন সৈন্যদের ছিল; কিন্তু এসব নেওয়া উচিত ছিল 'যথাযথ পদ্ধতিতে' হিসাব রেখে, যাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কোন নির্দেশ না দেওয়ায় সৈন্যরা মনে করেছিল, তারা যেখান থেকে যা খুশি তাই নিতে পারে। নিয়াজিও এটাকে উৎসাহিত করেছেন।

এসব অজুহাত ও যুক্তিসহ কমিশন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে উত্থাপিত সাতটি অভিযোগের উল্লেখ করেছে। অভিযোগগুলো হলো :

১. ঢাকায় ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরুর সময় অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও গোলাগুলি চালানো।

২. সামরিক পদক্ষেপ শুরুর পর গ্রামাঞ্চল দুষ্কৃতকারীমুক্ত করার অভিযানে (সুইপিং অপারেশন) নির্বিচার হত্যা ও অগ্নিসংযোগ।

৩. কেবল সামরিক অভিযানের প্রথম দিকেই নয়, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়েও বুদ্ধিজীবী এবং ডাক্তার, প্রকৌশলীর মতো অন্যান্য পেশাজীবীদের হত্যা ও গণকবরে পুঁতে রাখা।

৪. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যদের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করার সময় বা তাদের বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে হত্যা করা।

৫. সামরিক শাসন চালানোর সময় পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হত্যা অথবা তাদের বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া।

৬. প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা ও সৈন্যদের দ্বারা অত্যাচারের জন্য বহুসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানি নারী ধর্ষণ।

৭. সংখ্যালঘু হিন্দুদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা।

রিপোর্টে বলা হয়, এসব অভিযোগের ভয়াবহতা, সেগুলোর স্থায়ী ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৈতিক ও মানসিক শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে এসব অভিযোগ সম্পর্কে কমিশন বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে প্রত্যাগত সেনা অফিসারদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

সেনা কর্মকর্তাদের জবানবন্দিতে নৃশংসতার খণ্ডচিত্র

গণহত্যা, নির্যাতন ও লুটপাটের প্রকৃত ঘটনা কমিশন আড়াল করার চেষ্টা করলেও সংশ্লিষ্ট সেনাকর্মকর্তারা কমিশনের কছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় একে অপরের কাঁধে দোষ চাপাতে গিয়ে হয়তোবা নিজের অজান্তেই কিছু সত্য প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর তা থেকে নৃশংসতার ভয়াবহতা আঁচ করতে তেমন কষ্ট হয় না। এ যেন অনেকটা পুরাণে বর্ণিত মৈনাক পর্বতের চূড়ার মতই, যে চূড়াটা দেখে সাগরে নিমজ্জিত পর্বতের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি স্পষ্টতই তার পূর্বসূরি লে. জেনারেল টিক্কা খানের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, সামরিক অভিযান প্রথম থেকে অস্ত্রের সাহয্যে পরিচালিত হয় এবং অনেক জায়গয় শক্তির নির্বিচার ব্যবহার জনগণকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ওই সময় যে-ক্ষতি হয় তা আর সংশোধন করা যায়নি এবং সামরিক নেতারা 'চেঙ্গিস খান', 'পূর্ব পাকিস্তানের কসাই' প্রভৃতি কুখ্যাতি অর্জন করেন।

নিয়াজি ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল দায়িত্ব নিয়ে চার দিন পর লুট, ধর্ষণ, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন। তিনি কমিশনকে

বলেন, 'আমি জেনেছি যে, লুটের মালপত্র পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। এসবের মধ্যে গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি ছিল।' নিয়াজি সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে কোনো বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়নি।

অপরদিকে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী কমিশনকে বলেন, 'ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও অপমানজনক আচরণের ভয়াবহ বিবরণ সাধারণভাবে শোনা গেছে।' তিনি দাবি করেন, জনগণের মন জয় করার জন্য তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে তার লেখা এবং টিক্কা খানের সই করা চিঠি পূর্বাঞ্চল কমান্ডে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু নিয়াজি তা অবজ্ঞা করেন। ফরমান আলী তার সাক্ষ্যে আরো জানান, জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনই নিয়াজি জুনিয়র অফিসারদের বলেছিলেন, 'রেশনের অভাবের কথা কেন বলছো তোমরা? এ দেশে কি কেউ গরু-ছাগল পালে না? এটা শত্রু-দেশ। তোমাদের যখন যা প্রয়োজন নিয়ে নেবে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনসরুল হক (২৬০নং সাক্ষী) কমিশনকে বলেছেন, 'মুক্তিবাহিনী বা আওয়ামী লীগার সন্দেহে কাউকে ধরা হলেই তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বিস্তারিত তদন্ত না করেই বিনাবিচারে এমনকি যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ ছাড়াই কাউকে হত্যা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া কথাটি ব্যবহৃত হতো কোড বা সংকেত হিসেবে।' তিনি বলেন, হিন্দুদের হত্যা করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মনসুরুল হক ছিলেন ১ ডিভিশনের জিএসও। ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিকের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৭-২৮ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাসে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'একজন অফিসারসহ ৯১৫ ব্যাক্তিকে স্রেফ জবাই করে ফেলা হয়।' তিনি আরো বলেন, 'সালদা নদী এলাকায় ৫০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী গ্রামাঞ্চল ও ছোট শহরগুলেকে শত্রুমুক্ত করার অভিযানের নামে নির্দয়ভাবে ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে এগিয়ে গেছে।'

ব্রিগেডিয়ার ইকবালুর রহমান শরিফ (২৬৯নং সাক্ষী) জানান, জেনারেল গুল হাসান পূর্ব পকিস্তানে বিভিন্ন সেনা ইউনিট পরিদর্শনের সময় সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি কতজন বাঙালি মেরেছ?'

লে. কর্নেল আজিজ আহমেদ খান (২৭৬নং সাক্ষী) তার সাক্ষ্যে বলেন, বিগ্রেডিয়ার আরবাব তাকে জয়দেবপুরের সব বাড়ি-ঘর ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশ তিনি বহুলাংশে পালন করেছেন। তিনি আরো জানান, ঠাকুরগাঁও ও বরগুনায় তার ইউনিট পরিদর্শনে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

'কত হিন্দু মেরেছ?' আর ২৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ মালিক হিন্দুদের হত্যা করার লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে লে. কর্নেল আজিজ দাবি করেন।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ রাতে সামরিক অভিযানের সময় অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ এবং গুলি-গোলা ও বিস্ফোরক ব্যবহার সম্পর্কে বিগ্রেডিয়ার শাহ আবদুল কাসিম (২৬৭নং সাক্ষী) কমিশনকে বলেছেন, '২৫ মার্চ ঢাকার রাজপথে কোনো খণ্ডযুদ্ধ হয়নি। ওই রাতে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। অভিযানের সময় সৈন্যরা ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছে।' কমিশন এ অভিযোগও পেয়েছে যে, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ওই রাতে মর্টার দাগানো হয়েছিল, ফলে ঘনবসতিপূর্ণ ছাত্রাবাস দুটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওই হামলার ফলে ছাত্রাবাস দুটিতে কতজন ছাত্রের প্রাণহানি ঘটেছিল তা কমিশন উল্লেখ করেনি। তবে ঘটনার পরে ছাত্রদের সারি সারি লাশের ছবি বিদেশী পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিন উদ্দিন (২৮২নং সাক্ষী) তার সাক্ষ্যে বলেছেন, 'নিম্নপদস্থ বহু কর্মকর্তা তথাকথিত দুষ্কৃতকারী দমনের নামে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়। সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদের তুলনায় অনেক বেশি নৃশংস কায়দায় দুষ্কৃতকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং অনেক সময়ই তা করা হয়েছে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বলতে যা বোঝায় তা ভেঙে পড়েছিল। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে একটি কমান্ড এলাকায় (ধুমঘাট) ফায়ারিং স্কোয়াডে দুষ্কৃতকারীদের হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে খবর পাওয়ার পর আমি তা থামাই।'

ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান (সাক্ষী নং ২৪৩) স্বীকার করেছেন যে, 'বাঙালিদের জোর করে তুলে আনার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল।'

২৯ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল এস এস এইচ বোখারি (২৪৪নং সাক্ষী) তার সাক্ষ্যে বলেছেন, 'রংপুরে দুজন অফিসারসহ ৩০ জনকে বিনাবিচারে গুলি করে মারা হয়। অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।'

১৬ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ বলেন, 'বাঙালিদের বিনাবিচারে হত্যা করা হচ্ছিল বলে গুজব রটেছিল।'

৩৯ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল এস এম নঈম (২৫৮নং সাক্ষী) জানান, 'সুইপ অপারেশনের সময় বহু নিরীহ মানুষকে আমরা হত্যা করেছি। এ জন্য জনমনে অসন্তোষ দেখা দেয়।'

হত্যা, নির্যাতন ছাড়াও বড় ধরনের কয়েকটি লুটপাটের ঘটনাও প্রকাশ পেয়েছে সাক্ষীদের জবানবন্দিতে। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার

তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার ও পরে মেজর জেনারেল জাহানজেব আরবাবসহ ছয়জন অফিসার ও তাদের অধীনস্থ ইউনিটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ব্যাপক লুটতরাজের অভিযোগ। তৎকালীন ১৬ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ (২৪২নং সাক্ষী), ৯ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারি (২৩৩নং সাক্ষী) ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী (২১৮নং সাক্ষী) এসব অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে সিরাজগঞ্জে ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেজারি থেকে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লুট। একটি ট্রাকের চেসিসে করে ওই টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় পাকশি ব্রিজের কাছে একজন জেসিও ট্রাকটি থামান। ড্রাইভার তাকে একটি চিরকুটে মেজর সাদ্দাফের নামে লেখা ট্রাকটির ছাড়পত্র দেখায়। নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আনসারির নেতৃত্বে একটি তদন্ত আদালত এ বিষয়ে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিল; কিন্তু ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ লাগায় পরে তদন্ত আর এগোয়নি। এ লুটের ঘটনায় অভিযুক্ত অপর পাঁচজন অফিসার হলেন—তৎকালীন ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) মোজাফফর আলী খান জাহিদ, সাবেক ১৮ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল বাশারাত আহমেদ, সাবেক ৩২ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজ, সাবেক ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল মোহাম্মদ তোফায়েল এবং ১৮ পাঞ্জাবের মেজর সাদ্দাফ হোসেন শাহ।

কমিশন আড়াই কোটি টাকা লুটের আরেকটি অভিযোগেরও প্রমাণ পায়। ওই ঘটনায় ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন বলে কমিশন উল্লেখ করেছে।

ভুট্টো বিচার করেননি বলেই এখনো বিচার করা যাবে না!

পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকার ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে যুদ্ধের পরপরই গঠিত গোপন বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেও রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বরং এ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী একাত্তরের অপকর্মের বিচার দাবিতে পাকিস্তানি পত্রিকাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠলে সামরিক সরকার তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে নানা অজুহাত তুলে ধরে। ওই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল মঈনউদ্দিন হায়দার এক বিবৃতিতে বলেন, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দায়িত্ব ছিল সাবেক রাষ্ট্রপতি ও পরে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর।

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর মেয়ে ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষ থেকেই সরকারের যুক্তির অসাড়তা তুলে ধরে বলা হয়, ভুট্টো বিচার করেননি বলে এখন বিচার করা যাবে না এটা কোনো কথা হতে পারে না। পিপিপির তৎকালীন তথ্য সম্পাদক তাজ হায়দার বলেন, 'এত বছর পর চিলির সাবেক স্বৈরশাসক পিনোচেটের বিচার হতে পারলে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে একাত্তরের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের ব্যবস্থা করতে বাধা কোথায়?' পিপিপি বলেছে, অপরাধীদের মধ্যে যারা এখনো বেঁচে আছে এবং আরাম-আয়েশে জীবন কাটাচ্ছে তাদের বিচারের উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা স্বাগত জানাবে। তাজ হায়দার ২০০১ সালের ৩ জানুয়ারি তার বিবৃতিতে অবশ্য ভুট্টোর ভূমিকার সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেন, ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে আনা, যুদ্ধে হারানো ৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা পুনরুদ্ধার করা এবং পাকিস্তানের হৃত ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার কাজটা যে ওই সময়ে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ছিল সে বিষয়টি জেনারেল মঈন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) বুঝতে পারছেন না। তিনি বলেন, পাকিস্তানের এস্টাবলিশমেন্ট ও তার রাজনৈতিক দোসররা গত আড়াই দশক ধরেই দেশ ভাঙার দায় ভুট্টোর কাঁধে চাপানোর চেষ্টা করে আসছে। জেনারেল মঈনউদ্দিনের বিবৃতিতেও সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। তাজ বলেন, আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সময় জনপ্রিয় রাজনীতিকদের রাজনীতি থেকে দূরে ঠেলা দেওয়া, নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট কারচুপির মাধ্যমে হারিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়েই যে পাকিস্তান ভাঙার বীজ রোপন করা হয়, সে কথা সবারই খুব ভাল করে জানা। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টেও এসব কারণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তাজের বিবৃতিতে পিপিপির আগের বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে বলা হয়, এ রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সামরিক সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং এর মধ্য দিয়ে তাদের অসহায়ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। কেননা ভারতে সম্পূরক রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়েই সরকার এটি প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, সরকারের উচিত বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটসহ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নেতা ও জেনারেলদের বিচার এবং কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করা। প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য নেশন' বলেছে, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে সেনাবাহিনী সঠিক কাজ করেছে। রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী জেনারেলদের বিচারের ব্যবস্থা করার সঠিক কাজটিও তাদের করা প্রয়োজন। রিপোর্টের কপি পত্রিকাগুলোকে দেওয়ার দাবি জানায় পত্রিকাটি। এতে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়, রিপোর্ট প্রকাশের দায়িত্ব এমন এক কর্তৃপক্ষের হাতে পড়েছে যারা 'জাতির

অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের' দায়-দায়িত্বের ভাগীদার হতে চাইছে না।

'দ্য ফ্রন্টিয়ান পোস্ট' অভিযুক্ত জেনারেলদের বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। পত্রিকাটি জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে বলেছে, জেনারেল জিয়াউল হকের ১১ বছরের শাসনামলে দলের নেতারা রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানাননি।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী রিপোর্টে অভিযুক্তদের বিচারের ব্যাপারে কিছু বলেনি। অন্য বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছে দলটি। রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জামায়াত নেতা কাজী হোসেন আহমদ বলেন, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেশের সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু দুঃজনক যে, দীর্ঘদিন ধরে রিপোর্টটি লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছিল। জামায়াত নেতা বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর কিছু দুর্বলতা সারিয়ে ফেলা হয়েছে; তবে এখনো অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে যেগুলো দূর করার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সম্পদের প্রতি লালসাকেই তিনি সেনাবাহিনীর মূল ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করেন। একাত্তরের পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে কাজী হোসেন বলেন, পাকিস্তান ওই রকম আরেকটি ট্র্যাজেডি বরণ করতে পারবে না। কাজেই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সব খারাপ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই দূর করতে হবে।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে সেনাবাহিনীর মেসগুলোতে মদ্যপান ও অবাধ যৌনাচার নিষিদ্ধ করা এবং সামরিক দপ্তরগুলোর সম্পদের হিসাব প্রকাশ করার সুপারিশ করা হয়। কমিশন সামরিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিলেবাসও এমনভাবে পরিবর্তনের তাগিদ দেয় যাতে ধর্মীয়, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো হয়। রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে কোনোরকম আপোস করা যাবে না।

পাকিস্তান আওয়ামী তেহরিক দলের চেয়ারম্যান ড. তাহেরুল কাদরি এ রিপোর্ট প্রকাশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন, 'কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, আর দেশেরই বা কি স্বার্থ এতে রয়েছে?' তিনি আরো বলেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলো নিজেদের গা বাঁচাতেই এ রিপোর্ট আড়াল করে রেখেছিল। বর্তমানে এটি প্রকাশের কি কারণ রয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন না। তার মতে, এ রিপোর্ট প্রকাশের ফলে সেনাবাহিনীর বদনাম হবে।

রিপোর্টে নতুন করে ৩২টি পৃষ্ঠা যোগ করা হয়েছে!

জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সামরিক সরকার হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করার পরপরই পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এক গুরুতর

অভিযোগ উত্থাপন করে। অভিযোগে বলা হয়, একাত্তরে পরাজয়ের দায় তৎকালীন পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাঁধে চাপিয়ে তাকে এবং পিপিপিকে হেয় করার উদ্দেশে সরকার রিপোর্টের সঙ্গে নতুন করে ৩২টি পৃষ্ঠা যোগ করেছে। সরকার অবশ্য পিপিপির এ অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে।

পাকিস্তানের সরকারি সংবাদ সংস্থা এপিপির খবরে জানা যায়, একজন সরকারি মুখপাত্র পিপিপির অভিযোগকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারি মুখপাত্র বলেন, প্রয়াত জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেই এ কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশনের কার্যপরিধি বা টার্মস অব রেফারেন্সও তিনি অনুমোদন করেছিলেন এবং মূল রিপোর্টটিও তার কাছেই পেশ করা হয়েছিল।

মুখপাত্র আরো বলেন, সত্তরের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং তার মেয়ে বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপিপি কয়েক মেয়াদে দেশ শাসন করেছে। কিন্তু কখনই পিপিপি সরকার এ রিপোর্ট প্রকাশের সাহস দেখায়নি। তিনি বলেন, জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সরকার এ রিপোর্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়ে যে সাহস দেখিয়েছে এবং এটি যে তার একটি কৃতিত্ব, ইতিহাসে নিশ্চিত তা লিপিবদ্ধ থাকবে।

রিপোর্টটি প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলে পিপিপি। দলের একজন মুখপাত্র ইসলামাবাদে বলেন, পরাজয়ের জন্য দায়ী জেনারেলরা এখনো নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

ইয়াহিয়াসহ ১৫ সেনাকর্মকর্তার কোর্ট মার্শালের সুপারিশ

একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয়, 'দেশ ভাঙা', অনৈতিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সা, বাংলাদেশে বর্বর অত্যাচার-নির্যাতন চালানো এবং 'পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা'র মতো আরো কিছু অপরাধের জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানসহ ১৫ জন শীর্ষস্থানীয় সেনাকর্মর্তাকে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন করা এবং জনসমক্ষে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার সুপারিরশ করেছে হামুদুর রহমান কমিশন। অভিযুক্ত সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে তিনজন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া বাকি সবাই জেনারেল পদমর্যাদার অধিকারী। অভিযুক্তদের মধ্যে ছয়জন ওই সময়ে বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লে. জেনারেল এস জি এম পীরজাদা, লে. জেনারেল গুল হাসান, মেজর জেনারেল উমর ও মেজর জেনারেল মিঠার প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত। তারা ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের হাত থেকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও অবৈধভাবে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অপরাধমূলক চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। তাদের গোষ্ঠীগত

স্বার্থহাসিলের উদ্দেশে তারা ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিশেষ ধরনের ফলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে হুমকি, প্ররোচনা, এমনকি ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন এবং পরে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখতে কোনো কোনো দল ও নির্বাচিত সদস্যকে প্ররোচিত করেছেন। তারা পরস্পরের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় এবং আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ঘটে এবং পাকিস্তান ভেঙে যায়।' এ কজন জেনারেলকে কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় রণাঙ্গণে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পালনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যও দায়ী করেছে। কমিশন তাদের এসব 'অপরাধমূলক চক্রান্তের জন্য' জনসমক্ষে বিচার করে শাস্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এদের মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া সত্তরের দশকেই মারা যান। অন্যরা চাকরি থেকে পেনশন নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছেন।

বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকারী যে ছয়জন সেনাকর্মকর্তার কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করা হয়েছে তাদের পরিচয়, অপরাধ ও সুপারিশে উল্লিখিত শাস্তির বিবরণ :

১. লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি, *পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক:* কমিশন নিয়াজিকে ১৫টি অপরাধের জন্য কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন করার সুপারিশ করেছে। আরো কিছুদিন প্রতিরোধের শক্তি ও অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় পেশাগত ও সামরিক দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের জন্য কমিশন মুখ্যত নিয়াজিকেই দায়ী করেছে, পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্টের ২৪ ধারায় যার অনেক অপরাধই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। নিয়াজির বিরুদ্ধে ১৫টি অভিযোগ সংক্ষেপে এরকম– (i) ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে রাজনৈতিক-সামরিক বিভিন্ন লক্ষণ, ভারতীয় সমরসজ্জা ও রাওয়ালপিন্ডির সেনাসদর দপ্তর থেকে সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থতা এবং পাকিস্তান বাহিনীকে অগ্রবর্তী অবস্থানে পাঠানো অব্যাহত রেখে প্রতিরক্ষার জন্য অনুপযুক্ত শক্তিবিন্যাস ঘটানো; (ii) অধিনায়কোচিত পেশাগত যোগ্যতা দূরদর্শিতা ও উদ্যমের অভাব প্রদর্শন করে দেশের ভেতরে মুক্তিবাহিনীকে মোকাবিলার পরিবর্তে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য সময়োচিত উপযুক্ত সৈন্যসমাবেশে ব্যর্থতা; (iii) নগরদুর্গ ও শক্ত অবস্থানবিন্যাসে চরম অবহেলা, যার ফলে বেশ কয়েকটি অবস্থান অক্ষত থাকা সত্ত্বেও ঢাকার পতন ঘটে; (iv) ঢাকা রক্ষার জন্য ভারতীয় আক্রমণ ঠেকাতে নদী-প্রতিবন্ধকতা ব্যবহারে অগুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে পরিকল্পিতভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করার নির্দেশনা তার ১৯৭১ সালের ১৫ জুলাইয়ে ইস্যু করা ৪ নং আদেশে অন্তর্ভুক্ত করতে অবহেলা

করা; (v) প্রকৃতপক্ষে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইচ্ছাকৃত ও অমার্জনীয় অবহেলা প্রদর্শন; (vi) তার নেতৃত্বের দুর্বলতা ও সুস্পষ্ট নির্দেশের অভাবে অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলো টিকিয়ে রাখা এবং ৭৫ শতাংশ ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে অধীনস্থ ফরমেশন কমান্ডারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং তার বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও অপরিকল্পিত পশ্চাৎপদসরণে অহেতুক ক্ষয়ক্ষতি সাধন; (vii) যুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত নীতির প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা প্রদর্শন করে সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে বিবেচিত ৫৩ ব্রিগেড স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকাকে নিয়মিত সৈন্যহীন ও অরক্ষিত করে ফেরা; (viii) পরিবহন, ফেরি ইত্যাদির ব্যবস্থাপনায় অবহেলার দরুন শেষ মুহূর্তে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার মরিয়া প্রচেষ্টায়ও ব্যর্থতা এবং কিছু সৈন্য আনতে সক্ষম হলেও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আসা ও অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হওয়া; (ix) ভারতীয়দের ঢাকা দখলে আরো দুই সপ্তাহ লাগত বলে কমিশনের কাছে স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে ঢাকা রক্ষায় ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা এবং আগেই লজ্জাজনক আত্মসমর্পণে রাজি হওয়া; (x) যুদ্ধ পরিচালনায় নিজের দুর্বলতা ও অধীনস্থ কমান্ডারদের উৎসাহিত করতে ব্যর্থতার দরুন লড়াইয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা এবং আত্মসমর্পণের অনুমতি লাভের অভিপ্রায়ে ৬ বা ৭ ডিসেম্বরেই সেনাসদর দপ্তরে হতাশাব্যঞ্জক ও বিপদসংকেতপূর্ণ বার্তা প্রেরণ; (xi) সেনাসদর দপ্তর থেকে ১০ ডিসেম্বর গোপন বার্তায় নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনীকে ঢাকার অভ্যন্তরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইচ্ছাকৃতভাবে ও দুর্বোধ্য কারণে বন্ধ রাখা, যার ফলে আত্মসমর্পণেরর পর বিপুল পরিমাণ মূল্যবান সমরসম্ভার ভারতীয়দের হাতে তুলে দিতে হয়; (xii) ভারতীয় সেনাপ্রধানের কাছে নিজেই অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব পাঠানো সত্ত্বেও ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে অস্ত্র নামিয়ে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করতে রাজি হওয়া, যা পাকিস্তান বাহিনীর জন্য বিরল লজ্জার বিষয়; (xiii) উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন হয়ে নারীঘটিত চারিত্রিক অধঃপতনের কুখ্যাতি অর্জন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান পাচারের ব্যবসা করা, যা তার অধঃস্তন অফিসারসহ বাহিনীতে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছে; (xiv) ভারতের জব্বলপুরে বন্দি থাকাকালে এবং পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার পর সদর দপ্তরের ব্রিফিং কমিটি ও তদন্ত কমিশনের কাছে সত্য এড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরস্পর যোগসাজশ করে একই রকম সাজানো সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অন্য অফিসারদের হুমকি ও প্ররোচনা দান; এবং (xv) পাকিস্তানে ফিরে এ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যে, তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়ায় অধঃস্তন

অফিসার হিসেবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তা মানতে বাধ্য হন।

২. মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ, *ঢাকাস্থ ৩৬ এডহক ডিভিশনের সাবেক জিওসি.* তাকে পাঁচটি অপরাধে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন করার সুপারিশ করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে–ঢাকা প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধের দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা প্রদর্শন; ৫৩ ব্রিগেডকে ঢাকা থেকে ফেনীতে সরিয়ে নেওয়া হলে ঢাকা রক্ষার সামর্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ার কথা নিয়াজির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে না ধরা; আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে ৯৩ ব্রিগেডকে জামালপুর থেকে ঢাকায় আনার মাধ্যমে ঢাকার প্রতিরক্ষা দুর্বল করা এবং রাস্তায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির কারণ ঘটানো; আরো কিছু সময় ঢাকার দুর্গ রক্ষা করার মতো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ন্যূনতম সাহস না দেখানো; এবং ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের আগে ঢাকা ত্যাগকারী অফিসারদের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বণ্টনের ব্যাপারে হিসাব না দেওয়া।

৩. মেজর জেনারেল এম রহিম খান, *চাঁদপুরের ৩৯ এডহক ডিভিশনের সাবেক জিওসি.* তার বিরুদ্ধেও পাঁচটি অভিযোগে কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়, নিজের ডিভিশন, অধীনস্থ সৈন্য ও বিপুল সরঞ্জামের প্রতি দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে '৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি সবকিছু ফেলে পালিয়েছিলেন। তিনি নিজে, নৌবাহিনীর চারজন অফিসার ও ১৪ জন সদস্য ভারতীয় বিমান থেকে ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়েছিলেন। ১২ ডিসেম্বরেই তিনি নিয়াজিকে জানান যে, 'সব শেষ হয়ে গেছে, একদিনের মধ্যেই আমাদের চলে আসতে বলুন' অন্যথায় মুক্তিবাহিনী সবাইকে মেরে ফেলতে পারে। এছাড়া আত্মসমর্পণের আগেই বিশেষ ব্যবস্থায় পাকিস্তানে ফিরে গিয়েও সদর দফতরে সব কথা গোপন রাখেন তিনি।

৪. ব্রিগেডিয়ার জি এম বাকির সিদ্দিকী, *ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সাবেক চিফ অব স্টাফ (সিওএস).* নয়টি অভিযোগে তার কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে–প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডারের কাছে তথ্য প্রদানে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি; বন্দি অবস্থায় ভারতীয়দের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক, এমনকি এ ঘনিষ্ঠতার সুবাদে বন্দিদশায় একমাত্র তার পক্ষেই কলকাতায় কেনাকাটা করতে যাওয়ার অনুমতি লাভ; এবং পাকিস্তানে ফিরে একই রকম সাজানো বক্তব্য দেওয়ার জন্য সহবন্দি অফিসারদের হুমকি ও প্ররোচনা দান প্রভৃতি।

৫. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত, *নবম ডিভিশনের ১০৭ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার.* কমিশন তার বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগে কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে–যশোরে দুর্গ রক্ষার সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গাফিলতি; গাজীপুরে পাল্টা আঘাত হানার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্দেশ দিতে ব্যর্থতা;

এবং প্রয়োজনে মাগুরায় পরিকল্পিত পশ্চাৎপসরণের আদেশ অগ্রাহ্য করে সব রসদ ও গুলি-গোলা বিস্ফোরক ফেলে কাপুরুষের মতো যশোর দুর্গ ফেলে পলায়ন।

৬. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আসলাম নিয়াজি, *৩৯ এডহক ডিভিশনের ৫৩ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার.* তার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগের মধ্যে আছে–অযোগ্যতা, উদ্যোগহীন ও ভীরুতার কারণে তিনি ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর ৩৯ ডিভিশনের জিওসির নির্দেশ সত্ত্বেও শত্রুর হাত থেকে মুদাফরগঞ্জ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, ফলে ৬ ডিসেম্বরের দিকে শত্রুপক্ষ এলাকাটি দখল করে নেয়। আর সে কারণে ত্রিপুরা ও চাঁদপুরের মধ্যবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। তার সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ হলো ৯ ডিসেম্বর অধীনস্থ লোকজন ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-গোলা ও সরঞ্জাম ফেলে কাপুরুষের মতো লাকসাম থেকে পলায়ন। তার অধীনে প্রায় ৪ হাজার সৈন্য ছিল। এদের মধ্যে শপাঁচেক ছাড়া সবাইকেই তিনি ফেলে আসেন। সৈন্য ও অফিসাররা দিশেহারা হয়ে লাকসাম থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে বিপুল সংখ্যায় বন্দি ও ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সামরিক নীতিমালা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে এ ব্রিগেড কমান্ডার ডাক্তারসহ ১২৪ জন আহত ও অসুস্থ সৈন্যকে লাকসামে ফেলে আসেন তাদের কিছু না জানিয়েই।

এ ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানে দায়িত্ব পালনকারী যে তিনজন সেনাকর্মকর্তার কোর্ট মার্শালের সুপারিশ করা হয়েছে, তারা হলেন–লে. জেনারেল ইরশাদ আহমদ খান, মেজর জেনারেল আবিদ জাহিদ ও মেজর জেনারেল বি এম মোস্তফা।

পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার শাকারগড় তহশিলের প্রায় ৫০০ গ্রাম বিনা প্রতিরোধে 'শত্রু'র হাতে ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মতো ঘটনায় কর্তব্য পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইরশাদ আহমদ খানের বিচারের সুপারিশ করা হয়।

পাক সেনাবাহিনীর ১৫ ডিভিশনের সাবেক জিওসি মেজর জেনারেল আবিদ জাহিদ শিয়ালকোট জেলার প্রায় ৯৮টি গ্রাম বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দিয়ে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করায় তার বিচার করা উচিত বলে কমিশন মত দেয়।

পশ্চিম রণাঙ্গনে রাজস্থান এলাকায় রামগড়ে ভারতীয় অবস্থান দখল করে নেওয়ার আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৮ ডিভিশনের সাবেক জিওসি মেজর জেনারেল বি এম মোস্তফা পাকসেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষতির কারণ ঘটানোয় তার বিচার করার কথা বলা হয় রিপোর্টে।

আরো তদন্ত প্রয়োজন

উল্লিখিত ১৫ সেনাকর্মকর্তার বিচারের সুপারিশ ছাড়া এদের মধ্যেই কারো কারো বিরুদ্ধে আরো কিছু অভিযোগের অপর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের দরুন এবং এর বাইরেও বেশ কজন সেনাকর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরো তদন্ত চালানোর সুপারিশ করেছে কমিশন। সুপারিশে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর

পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তৎপরতা চালানোর সময় পাকিস্তান বাহিনীর বর্বর অত্যাচার-নির্যাতনের যেসব অভিযোগ অব্যাহতভাবে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর তদন্তের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত আদালত বা তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। এর উদ্দেশ্য হবে যারা ওইসব বর্বরতা সঙ্গে জড়িত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য দুর্নাম বয়ে এনেছে, নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে নৃশংসতা ও অনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের সহানুভূতি হারিয়েছে তাদের বিচার করা। তদন্ত আদালতের কার্যক্রম প্রকাশ না করা হলেও জাতীয় বিবেক ও আন্তর্জাতিক জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য এর গঠন প্রকৃতি বা কাদের নিয়ে এটি গঠন করা হলো তা প্রকাশ করতে হবে। কমিশন মনে করে, এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ তদন্ত চালানোর জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ এখন পাকিস্তানে আছে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছে তাই তাদের কাছে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে পারে সেগুলো এ তদন্ত আদালতের কাছে পাঠানোর জন্য ঢাকা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করাও সম্ভব।'

এ পর্যায়ে কমিশন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের এবং বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকারী যেসব সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তদন্ত করতে বলেছে সেগুলো সংক্ষেপে এ রকম :

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান ও মেজর জেনারেল খুদা দাদ খানের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতা, মদ্যপানে আসক্তি ও দুর্নীতির অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও বিচার হওয়া উচিত বলে কমিশন মনে করে। কেননা প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় যে, চারিত্রিক অধঃপতন তাদের সিদ্ধান্তহীনতা, কাপুরুষতা ও পেশাগত অযোগ্যতার কারণ।

লে. জেনারেল নিয়াজির বিরুদ্ধে শিয়ালকোট, লাহোর ও ঢাকায় ব্যক্তিগত চরিত্রজনিত কুখ্যাতি অর্জন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান চোরাচালানের ব্যবসায় জড়িত থাকার যেসব অভিযোগ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তদন্ত করে বিচার বা তার সামরিক পেশাগত কাজে অপরাধের বিচারের সঙ্গে এসব অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫৭ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবসহ ছয়জন অফিসার ও তাদের অধীনস্থ ইউনিট বাংলাদেশে ব্যাপক লুটতরাজ ও ধনসম্পদ আহরণে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ আছে। নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারির নেতৃত্বে একটি তদন্ত আদালত কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ লাগার পর তদন্ত আর এগোয়নি। কমিশনের কাছে সাক্ষ্যে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুতর

অভিযোগ আনেন ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আব্বাস বেগ; তা হলো—পাকিস্তানের মুলতানে সামরিক আইন প্রশাসক থাকার সময় মুলতান পৌর কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত একজন সিভিল সার্ভিস অফিসারকে সামরিক আইনের অধীনে দুর্নীতির তদন্তের ভয় দেখিয়ে ১ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করা। ওই পৌর চেয়ারম্যান আত্মহত্যা করেন। এ ব্রিগেডিয়ারের কোন শাস্তি না হওয়ায় এবং বিচার প্রক্রিয়া শেষ না করে তাকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে একটি ডিভিশনের জিওসি নিয়োগ করায় হামুদুর রহমান কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশের ঘটনার জন্য মে. জে. আনসারির নেতৃত্বে তদন্ত আদালতের কাজ অবিলম্বে শুরু করে শেষ করার পরামর্শ দিয়েছে।

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সুপারিশ ছাড়া কমিশন 'পূর্ব পাকিস্তানে' অপরাধ সংঘটন ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য কয়েকজন সেনাকর্মকর্তার বিরুদ্ধে লঘু সাজা তথা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেনাবাহিনীতে না রাখার সুপারিশ করে। এরকম তিনজন কর্মকর্তা হলেন :

১. হিলির কিছু অংশ বাদে পুরো রংপুর ও দিনাজপুর জেলার (তৎকালীন বৃহত্তর জেলা) দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৩ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এস এ আনসারি,

২. বিনা যুদ্ধে ঝিনাইদহ পরিত্যাগকারী নবম ডিভিশনের ৫৭ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মনজুর আহমেদ, এবং

৩. ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় পশ্চাৎপসরণের সময় ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি ৩৬ এডহক ডিভিশনের অধীন ৯৩ ব্রিগেডের সাবেক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান।

শেষোক্ত ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে 'আন্তঃসার্ভিস বাছাই কমিটির সভাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সময় যেসব (বাঙালি) সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মচারী এবং বেসরকারি লোক 'বিপথগামী' হয়েছে বা যাদের সম্পর্কে 'খারাপ রিপোর্ট' গেছে তাদের বাছাই করার দায়িত্বে ছিলেন। তখন তার হেফাজতে বিনাবিচারে কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

কমিশন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্ব পালনকারী ব্রিগেডিয়ারের নিম্নপদস্থ কোনো সেনাকর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব খতিয়ে দেখেনি। তবে কমিশন বলেছে, যুদ্ধ ও নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জুনিয়র অফিসারদের দায়-দায়িত্বের গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে কমিশনের নজরে আসায় সেগুলো মূল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশন স্ব স্ব সার্ভিস হেডকোয়ার্টার ও অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা ওই জুনিয়র অফিসারদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছে।

টিক্কা খান-ফরমান আলী ভালো মানুষ!

সেনাকর্মকর্তাদের অপরাধের দায়-দায়িত্ব নিরূপনের ক্ষেত্রে হামুদুর রহমান কমিশন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে অভিযোগ থেকে পুরোপুরি রেহাই দিয়ে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করেছে। টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে মনোনয়ন নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাকে শপথবাক্য পাঠ করানো থেকে বিরত থাকেন। ২৫ মার্চের পরে অবশ্য তিনি শপথ নিতে সক্ষম হন। টিক্কা খান বাঙালির রক্তে গোসল করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই তাকে বলা হতো 'কসাই'। কমিশনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে জেনারেল নিয়াজিও টিক্কা খান সম্পর্কে বলেছেন, তিনি (নিয়াজি) দায়িত্ব গ্রহণের আগে পূর্ব পাকিস্তানে যে বর্বরতা চালানো হয়েছিল সেজন্য সমর নেতারা 'চেঙ্গিস খান' 'পূর্ব পাকিস্তানের কসাই' হিসেবে অভিহিত হন। অথচ টিক্কা খানের বিরুদ্ধে কমিশন কোনো অভিযোগই আনেনি। কমিশনের রিপোর্টে ২৫-২৬ মার্চ সামরিক অভিযানের সময় অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ তথা ভারী ও হাল্কা সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে মানুষ মারার কথা উল্লেখ করা হলেও ২৫ মার্চের আগে সামরিক অ্যাকশনের পরিকল্পনায় অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও বর্বরতার কথা চিন্তা করা হয়েছিল বলে কোনো প্রমাণ কমিশন খুঁজে পায়নি। আর এসব অজুহাতেই অভিযোগ থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে টিক্কা খানকে। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানি পত্রপত্রিকায়ও সমালোচনা হয়েছে এবং কী কারণে কমিশন টিক্কা খান ও ফরমান আলীকে রেহাই দিয়েছে তাও আলোকপাত করা হয়েছে।

জেনারেল ফরমান আলী সম্পর্কে কমিশন পৃথক একটি উপ-অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছে। এর কারণ হিসেবে কমিশন বলেছে, আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে ফরমান আলীর নাম এসেছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

ফরমান আলী একজন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় এসে সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯৬৯ সালের মার্চে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের পর তিনি আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরে বিগ্রেডিয়ার (অসামরিক বিষয়) নিযুক্ত হন। ওই সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি তিনি কিছু সময় মেজর জেনারেল

(রাজনৈতিক বিষয়) পদে এবং শেষ পর্যন্ত দালাল গভর্নর ডা. মালিকের উপদেষ্টা পদে কাজ করেন। ওই সময় পাকবাহিনীর সহযোগী বাঙালি জামায়াত, মুসলিম লীগ, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর নেতাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ দেখা-সাক্ষাৎ ও বৈঠকের খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়কারী হিসেবে তার ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কমিশন ফরমান আলীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি। উল্টো তার প্রশংসা করেছে।

জেনারেল ফরমান আলী বিচক্ষমতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। কমিশন বলেছে, জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। নিয়াজি সময়ে সময়ে ফরমান আলীর পরামর্শ গ্রহণ করলে যুদ্ধের সময় লজ্জানজক ঘটনা এড়ানো যেত।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাকে বলেছিলেন, রাও ফরমান আলী সরকারি কাগজে নিজ হাতে লিখেছিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানের সবুজকে লাল করে দিতে হবে।' গণহত্যার ইঙ্গিতবাহী সন্দেহে এ কথাগুলো লেখা কাগজের ফটোকপি পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া হয়। হামুদুর রহমান কমিশন তা দেখে এ বিষয়ে ফরমান আলীর বক্তব্য জানতে চায়। ফরমান আলী জানান, তিনি টেলিফোনে কথা বলার সময় অফিসের সাদা প্যাডে টুকরো কথা লেখার মধ্যে এটি লিখে থাকতে পারেন। কথাটা পল্টন ময়দানে ভাষণে ন্যাপ নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র বানানোর অর্থে ওই কথা বলেছিলেন। তাকে ডেকে উত্তেজক কথা না বলার জন্য সাবধানও করা হয়েছিল। ফরমান আলী কমিশনকে আরো বলেন, তিনি কাগজটির কোনো গুরুত্ব দেননি বলে টেবিলে পড়ে থেকে পরে তা তার অফিসের কোনো বাঙালি কর্মচারীর হস্তগত হয়ে থাকতে পারে।

কমিশন ফরমান আলীর বক্তব্য বিশ্বাস করে তাকে সব সন্দেহের উর্ধ্বে স্থান দেয়। তাকে একজন বুদ্ধিমান, সৎ অফিসার এবং কোনো সময়ই তিনি ইয়াহিয়া জান্তার ভেতরের চক্রের সদস্য ছিলেন না বলেও উল্লেখ করেছে কমিশন।

শীর্ষস্থানীয় ঘাতক ও দালালরা

একাত্তরের নয় মাস বাংলাদেশকে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়েছিল পাকিস্তানের বর্বর সামরিক বাহিনী এ দেশের কিছু ঘৃণিত দালালের যোগসাজশে। ওই সময় বাঙালিদের ওপর হামলে পড়েছিল এক লাখের মতো পাকিস্তানি সেনা। তারা এ দেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিল।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের সময় পাকিস্তানি সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজারের মতো। এদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে প্রথমে পাঠানো হয় ভারতে। পরে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত পাঠানো হয় পাকিস্তানে। তবে ১৯৫ জনকে চিহ্নিত করা হয় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। কথা ছিল যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত সেনাকর্মকর্তাদের বিচার করবে পাকিস্তান নিজেই।

প্রয়াত ভারতীয় কূটনীতিক জেএন দীক্ষিত তার Liberation and Beyond বইয়ে লিখেছেন, বাংলাদেশে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত হিসেবে প্রথমে চিহ্নিত করা হয়েছিল পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর ৪০০ কর্মকর্তাকে। কিন্তু ১৯৭২ সালের জুলাই মাস নাগাদ বাংলাদেশ সরকার এ সংখ্যা কমিয়ে আনে ১৯৫-এ। ব্রাসেলস ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের শিক্ষক এবং বাংলাদেশ জেনোসাইড স্টাডিজের প্রধান আহমেদ জিয়াউদ্দিন কয়েক বছর আগে এমন ২০০ অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রকাশ করেন যারা একাত্তরে গণহত্যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। এদের মধ্যে ১৯৪ জন সেনাবাহিনীর এবং অন্যরা বিমান ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তা।

গণহত্যার অভিযোগে চিহ্নিত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারা

১. লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি
২. মে. জেনারেল নজর হুসেইন শাহ
৩. মে. জেনারেল মোহাম্মদ হুসেইন আনছারী
৪. মে. জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদ
৫. মে. জেনারেল কাজী আবদুল মজিদ খান
৬. মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী
৭. ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান
৮. ব্রিগেডিয়ার আরিফ রাজা
৯. ব্রিগেডিয়ার আতা মুহাম্মদ খান মালিক
১০. ব্রিগেডিয়ার বশির আহমেদ

১১. ব্রিগেডিয়ার ফাহিম আহমেদ খান
১২. ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার আহমেদ রানা
১৩. ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদ
১৪. ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর হুসেইন আতিফ
১৫. ব্রিগেডিয়ার মিয়া মনসুর মুহাম্মদ
১৬. ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিন উদ্দিন
১৭. ব্রিগেডিয়ার মীর আবদুল নাইম
১৮. ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ আসলাম
১৯. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াত
২০. ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ শাফি
২১. ব্রিগেডিয়ার এন এ আশরাফ
২২. ব্রিগেডিয়ার এস এ আনছারী
২৩. ব্রিগেডিয়ার সাদ উল্লাহ খান এস জে
২৪. ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ আসগর হাসান
২৫. ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ শাহ আবদুল কাসেম
২৬. ব্রিগেডিয়ার তাজমাল হুসেইন মালিক
২৭. কর্নেল ফজলে হামিদ
২৮. কর্নেল কে কে আফ্রিদী
২৯. কর্নেল মুহম্মদ খান
৩০. কর্নেল মুহাম্মদ মুশাররফ আলী
৩১. লে. কর্নেল আবদুল গফুর
৩২. লে. কর্নেল আফতাব এইচ কুরেশী
৩৩. লে. কর্নেল আবদুর রহমান আওয়ান
৩৪. লে. কর্নেল আবদুল হামিদ খান
৩৫. লে. কর্নেল আবদুল্লাহ খান
৩৬. লে. কর্নেল আহমেদ মুখতার খান
৩৭. লে. কর্নেল আমির মোহাম্মদ খান (৭ এসইসি এমএল)
৩৮. লে. কর্নেল আমির নওয়াজ খান
৩৯. লে. কর্নেল আমির মোহাম্মদ খান (৩৪ পাঞ্জাব)
৪০. লে. কর্নেল এ শামস উল জামান
৪১. লে. কর্নেল আশিক হুসেইন
৪২. লে. কর্নেল আজিজ খান
৪৩. লে. কর্নেল গোলাম ইয়াসিন সিদ্দিকী
৪৪. লে. কর্নেল ইসরাত আলী আলভী
৪৫. লে. কর্নেল মুক্তার আলম হীজাজী

৪৬. লে. কর্নেল মোস্তফা আনোয়ার
৪৭. লে. কর্নেল এম. আর কে মির্জা
৪৮. লে. কর্নেল মতলুব হোসেন
৪৯. লে. কর্নেল মোহাম্মদ আকরাম
৫০. লে. কর্নেল মোহাম্মদ আকবর
৫১. লে. কর্নেল মোহাম্মদ নওয়াজ
৫২. লে. কর্নেল মুমতাজ মালিক
৫৩. লে. কর্নেল এমএমএম বেইজ
৫৪. কর্নেল মোহাম্মদ মতিন
৫৫. লে. কর্নেল মাজহার হোসেন চৌহান
৫৬. লে. কর্নেল মুক্তাহার আহমেদ সৈয়দ
৫৭. লে. কর্নেল মুস্তাফাজান
৫৮. লে. কর্নেল ওমান আলী খান
৫৯. লে. কর্নেল রিয়াজ হোসেন জাভেদ
৬০. লে. কর্নেল রশিদ আহমেদ
৬১. লে. কর্নেল শেখ মোহাম্মদ নাঈম
৬২. লে. কর্নেল সারফাজ খান মালিক
৬৩. লে. কর্নেল এসএফএইচ রিজভি
৬৪. লে. কর্নেল এসএইচ বুখারি
৬৫. লে. কর্নেল সৈয়দ হামিদ সাফি
৬৬. লে. কর্নেল সুলতান বাদশাহ
৬৭. লে. কর্নেল সুলতান আহমেদ
৬৮. লে. কর্নেল এসআরএইচএস জাফরি
৬৯. লে. কর্নেল জায়েদ আগা খান
৭০. লে. কর্নেল এমওয়াই মালিক
৭১. মেজর আবদুল গাফরান
৭২. মেজর আনিস আহমেদ
৭৩. মেজর আরিফ জাভেদ
৭৪. মেজর আতা মোহাম্মদ
৭৫. মেজর আবদুল হামিদ
৭৬. মেজর এএসপি কোরেশী
৭৭. মেজর আশফাক আহমেদ চীমা
৭৮. মেজর আবদুল খালেক কায়ানি

৭৯. মেজর আবদুল ওয়াহেদ মুঘল
৮০. মেজর আবদুল হামিদ খাট্টাক
৮১. মেজর আহমেদ হাসান খান
৮২. মেজর আনিস আহমেদ খান
৮৩. মেজর আবদুল ওয়াহিদ খান
৮৪. মেজর সিএইচ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৮৫. মেজর গোলাম মোহাম্মদ
৮৬. মেজর গোলাম আহমেদ
৮৭. মেজর গাজ্জানফার আলী নাসির
৮৮. মেজর হাদি হোসেন
৮৯. মেজর হাসান মুজতবা
৯০. মেজর ইফতিখার উদ্দিন আহমেদ
৯১. মেজর ইফতিখার আহমেদ
৯২. মেজর শাহ্ মোহাম্মদ ওসমান ফারুকী
৯৩. মেজর খুরশীদ ওমান
৯৪. মেজর খুরশীদ আলী
৯৫. মেজর খিজার হায়াৎ
৯৬. মেজর মেহের মোহাম্মদ খান
৯৭. মেজর এম আবদুল্লাহ খান
৯৮. মেজর মোহাম্মদ আফজাল
৯৯. মেজর এম ইসহাক
১০০. মেজর মোহাম্মদ হাফিজ রাজা
১০১. মেজর মোহাম্মদ ইউনুস
১০২. মেজর মোহাম্মদ আমিন
১০৩. মেজর মোহাম্মদ লোধী
১০৪. মেজর মির্জা আনোয়ার বেগ
১০৫. মেজর এমএকে লোধী
১০৬. মেজর মাদাদ হোসেন শাহ্
১০৭. মেজর মোহাম্মদ আইউব খান
১০৮. মেজর মোহাম্মদ শরিফ আরিয়ান
১০৯. মেজর মোহাম্মদ ইফতেখার খান
১১০. মেজর এম ইয়াহিয়া হামিদ খান
১১১. মেজর মোহাম্মদ ইয়ামিন

১১২. মেজর মোহাম্মদ গজনফর
১১৩. মেজর মোহাম্মদ সারওয়ার
১১৪. মেজর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
১১৫. মেজর মোহাম্মদ আশরাফ
১১৬. মেজর মোহাম্মদ আশরাফ খান
১১৭. মেজর মোহাম্মদ সফদার
১১৮. মেজর এমএম ইস্পাহানী
১১৯. মেজর মোহাম্মদ জামিল
১২০. মেজর মোহাম্মদ সফি
১২১. মেজর মো. আজিম কোরেশী কোরেস
১২২. মেজর মো. জুলফিকার রাথুর
১২৩. মেজর মোশতাক আহমেদ
১২৪. মেজর নাসির খান
১২৫. মেজর নাসির আহমেদ
১২৬. মেজর রানা জহুর মহিউদ্দিন খান
১২৭. মেজর রিফাত মাহমুদ
১২৮. মেজর রুস্তম আলী
১২৯. মেজর আরএম মমতাজ খান
১৩০. মেজর সরদার খান
১৩১. মেজর মোহাম্মদ আজম খান
১৩২. মেজর সাইফ উল্লাহ খান
১৩৩. মেজর এসটি হোসেন
১৩৪. মেজর এসএমএইচএস বুখারী
১৩৫. মেজর সাজিদ মাহমুদ
১৩৬. মেজর শের-উর-রেহমান
১৩৭. মেজর সালামত আলী
১৩৮. মেজর সাজ্জাদ আখতার মালিক
১৩৯. মেজর সেলিম এনায়েত খান
১৪০. মেজর সুলতান সাউদ
১৪১. মেজর সরফরাজ উদ্দিন
১৪২. মেজর শওকাতুল্লাক খাট্টাক
১৪৩. মেজর সুলতান সুরখরো আওয়ান
১৪৪. মেজর সরফরাজ আলম
১৪৫. মেজর সারওয়ার খান
১৪৬. মেজর তাফির-উল ইসলাম

১৪৭. মেজর জাউমুল মালুক
১৪৮. ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহিদ
১৪৯. ক্যাপ্টেন আফতাব আহমেদ
১৫০. ক্যাপ্টেন আরিফ হোসেন শাহ
১৫১. ক্যাপ্টেন আবরার হোসেন
১৫২. ক্যাপ্টেন আমজাদ শাব্বির বুখারী
১৫৩. ক্যাপ্টেন আউসাফ আহমেদ
১৫৪. ক্যাপ্টেন আবদুল কাহার
১৫৫. ক্যাপ্টেন আসরাফ মির্জা
১৫৬. ক্যাপ্টেন আবদুল রশিদ নায়ার
১৫৭. ক্যাপ্টেন আমান উল্লাহ
১৫৮. ক্যাপ্টেন আজিজ আহমেদ
১৫৯. ক্যাপ্টেন গুলফরাজ খান আব্বাসী
১৬০. ক্যাপ্টেন ইকরামুল হক
১৬১. ক্যাপ্টেন ইজাজ আহমেদ চীমা
১৬২. ক্যাপ্টেন ইফতিখার আহমেদ গোনদাল
১৬৩. ক্যাপ্টেন ইসহাক পারভেজ
১৬৪. ক্যাপ্টেন ইকবাল শাহ
১৬৫. ক্যাপ্টেন জাভেদ ইকবাল
১৬৬. ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর কৈয়ানি
১৬৭. ক্যাপ্টেন কারাম খান
১৬৮. ক্যাপ্টেন মানজার আমিন
১৬৯. ক্যাপ্টেন মুজাফফর হোসেন নকভি
১৭০. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সাজ্জাদ
১৭১. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ জাকির রাজা
১৭২. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আরিফ
১৭৩. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফ
১৭৪. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ইকবাল
১৭৫. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ রাফি মুনির
১৭৬. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ জামিল
১৭৭. ক্যাপ্টেন নাঈম আকিব
১৭৮. ক্যাপ্টেন শের আলী
১৭৯. ক্যাপ্টেন সালমান মাহমুদ
১৮০. ক্যাপ্টেন শামশেদ সারওয়ার
১৮১. ক্যাপ্টেন শহীদ রেহমান

১৮২. ক্যাপ্টেন সালেহ হুসেইন
১৮৩. ক্যাপ্টেন শওকত নওয়াজ খান
১৮৪. ক্যাপ্টেন জাহিদ জামান
১৮৫. লেফটেন্যান্ট মুনীর আহমেদ বাট
১৮৬. লেফটেন্যান্ট জাফর জং
১৮৭. মেজর নাসির আহমেদ খান শেরওয়ানী
১৮৮. মেজর ফায়াজ মোহাম্মদ
১৮৯. মেজর মিয়া ফখরুদ্দিন
১৯০. ক্যাপ্টেন হেদায়েত উল্লাহ খান
১৯১. ক্যাপ্টেন মো. সিদ্দিকী
১৯২. ক্যাপ্টেন খলিল উর রহমান
১৯৩. মেজর নাদির পারভেজ খান
১৯৪. ক্যাপ্টেন হাসান ইদ্রিস
১৯৫. এয়ার কমোডর ইনাম উল হক খান
১৯৬. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এমএ মজিদ বেগ
১৯৭. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খলিল আহমেদ
১৯৮. রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শরিফ
১৯৯. কমোডর ইকরামুল হক মালিক
২০০. কমোডর খতিব মাসুদ হোসেন

তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। যারা আত্মসমর্পণের পর যুদ্ধবন্দি ছিল, তাদের মধ্য থেকেই এই তালিকা করা হয়। অথচ একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে টিক্কা খানের মতো জঘন্য যুদ্ধাপরাধী-গণহত্যাকারীও রয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি

০১. খাজা খয়ের উদ্দিন (সভাপতি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ)– আহ্বায়ক
০২. এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)
০৩. গোলাম আযম (আমির, জামায়াতে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান)
০৪. মাহমুদ আলী (পিডিপি)
০৫. আবদুল জব্বার খদ্দর (সহসভাপতি, পিডিপি)
০৬. মওলানা সিদ্দিক আহমদ (নেজামে ইসলাম)
০৭. আবুল কাসেম (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)
০৮. ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া
০৯. মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম (সভাপতি, ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ)

১০. আবদুল মতিন (মুসলিম লীগ)
১১. অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার (জামায়াতে ইসলামী)
১২. সৈয়দ আজিল হক নান্না মিয়া (পিডিপি)
১৩. পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া (সভাপতি, নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান শাখা)
১৪. এ এস এম সোলায়মান (কৃষক শ্রমিক পার্টি)
১৫. এ কে রফিকুল হোসেন (পিডিপি)
১৬. নুরুজ্জামান (ইয়ং পাকিস্তান সম্পাদক)
১৭. অ্যাডভোকেট আতাউল হক খান (মুসলিম লীগ)
১৮. অ্যাডভোকেট ফজলুল হক চৌধুরী
১৯. মেজর (অব) আফসার উদ্দিন (এনডিপি)
২০. অ্যাডভোকেট এ টি সাদি
২১. অ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান (পিডিপি)
২২. মকবুলুর রহমান
২৩. আলহাজ মোহাম্মদ আকিল (নেজামে ইসলাম)
২৪. প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দুস (জামায়াতে ইসলামী)
২৫. মৌলভী ফরিদ আহমদ (পিডিপি)– সম্পাদক
২৬. আব্বাস আলী খান (জামায়াত)– সংগঠক
২৭. এ এন মল্লিক– সম্পাদক
২৮. মওলানা মিয়া মফিজুল হক
২৯. অ্যাডভোকেট আবু সালেক
৩০. অ্যাডভোকেট আবদুন নঈম
৩১. আলহাজ সিরাজুদ্দিন (মুসলিম লীগ)
৩২. সৈয়দ মোহসেন আলী
৩৩. ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন (কনভেনশন মুসলিম লীগ)
৩৪. তোয়াহা বিন হাবিব (খেলাফত আন্দোলন)
৩৫. হাকিম ইরতেজাউর রহমান আখুনজাদা
৩৬. দেওয়ান ওয়ারাসাত খান
৩৭. নূরুল হক মজুমদার (মুসলিম লীগ)– অফিস সেক্রেটারি
৩৮. মাহবুবুর রহমান গোরহা (জামায়াতে ইসলামী)– সহ-সভাপতি
৩৯. ফয়েজ বক্স (মুসলিম লীগ)
৪০. রাজা ত্রিদিব রায়
৪১. আবু সালেম
৪২. মো. আকিল

৪৩. এ নূরুল করিম
৪৪. ওয়াজিউল্লাহ খান
৪৫. আফতাব আহমেদ
৪৬. মকবুল ইকবাল
৪৭. আখতার হামিদ খান
৪৮. এ এন এম ইউসুফ (কনভেনশন মুসলিম লীগ)
৪৯. মাহবুবুল হক দোলন (কাইয়ুম মুসলিম লীগ)
৫০. কে জি করিম (মুসলিম ছাত্রলীগ)
৫১. এ কে এম মুজিবুল হক (মুসলিম লীগ)
৫২. জুলমত আলী খান (পিডিপি)
৫৩. অ্যাডভোকেট জলিল (পিডিপি)
৫৪. আবদুল খালেক (জামায়াত)
৫৫. মওলানা আবদুর রহিম
৫৬. আবদুল মতিন (মুসলিম লীগ)
৫৭. ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া (কনভেনশন লীগ)
৫৮. মতিউর রহমান খান
৫৯. অ্যাডভোকেট ফিরোজ সিদ্দিকী

জেলা ও মহকুমা শান্তি কমিটি

১১ মে *দৈনিক সংগ্রাম* ও *পাকিস্তান অবজারভার*-এ বেশ কয়েকটি জেলা শান্তি কমিটি গঠনের খবর ছাপা হয়। কমিটিগুলো নিম্নরূপ :

আজিজুর রহমান (সাবেক এমএনএ)– আহ্বায়ক কুমিল্লা জেলা শান্তি কমিটি
এ কে এম ইউসুফ (সাবেক এমএনএ)– আহ্বায়ক খুলনা জেলা শান্তি কমিটি
সৈয়দ শামসুর রহমান (সাবেক এমসিএ)– আহ্বায়ক যশোর জেলা শান্তি কমিটি
সিরাজুল ইসলাম (সাবেক এমএনএ)– আহ্বায়ক রংপুর জেলা শান্তি কমিটি

একই দিনে কয়েকটি মহকুমা ও থানা কমিটির আহ্বায়কের নামও ছাপা হয় পত্রিকা দুটিতে। এরা হলো :

এম আবদুস সালাম (সাবেক এমএলএ)– আহ্বায়ক ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শান্তি কমিটি
মৌলভী কাউচউদ্দিন– সভাপতি নাটোর মহকুমা শান্তি কমিটি
মৌলভী আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী– সম্পাদক নাটোর মহকুমা শান্তি কমিটি
ডা. শফিউদ্দিন আহম্মেদ– আহ্বায়ক নওয়াবগঞ্জ (ঢাকা) থানা শান্তি কমিটি
কবি বেনজির আহমেদ (সাবেক এমএনএ)– আহ্বায়ক আড়াইহাজার থানা শান্তি কমিটি

এছাড়া অ্যাডভোকেট নূরুল হক মজুমদার ও অ্যাডভোকেট এ কে ফজলুল হক

চৌধুরীকে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় শান্তি কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অ্যাডভোকেট জুলমত আলী খান ও এ কে এম মুজিবুল হককে দায়িত্ব দেওয়া হয় টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় শান্তি কমিটি গঠনের।

একাত্তরে দৈনিক পাকিস্তান, ডেইলি মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন এলাকার শান্তি কমিটির নেতা হিসেবে আরো যাদের নাম ছাপা হয়েছে তারা হলো :

সিরাজ উদ্দিন (কনভেনশন লীগ)– সভাপতি, ঢাকা শহর শান্তি কমিটি
মনছুর আলী– সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা শহর শান্তি কমিটি
শেখ ঈমান আলী– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, রায়েরবাজার, ঢাকা
এ বি এম খালেক মজুমদার (জামায়াত)– সদস্য, ঢাকা শহর শান্তি কমিটি
আশরাফুজ্জামান– সদস্য, ঢাকা শহর শান্তি কমিটি
ফখরুদ্দীন আহমেদ– আহ্বায়ক, জেলা শান্তি কমিটি, ময়মনসিংহ
এম এ হান্নান– যুগ্ম-আহ্বায়ক, জেলা শান্তি কমিটি, ময়মনসিংহ
এ কে মুজিবুল হক– আহ্বায়ক, মহকুমা শান্তি কমিটি, ময়মনসিংহ
কবিরাজ মোক্তার হোসেন– সম্পাদক, মহকুমা শান্তি কমিটি, ময়মনসিংহ
এ খালেক নেওয়াজ– নেতা, ময়মনসিংহ উত্তর মহকুমা শান্তি কমিটি
হাশমত আলী– নেতা, ময়মনসিংহ উত্তর মহকুমা শান্তি কমিটি
মৃত মক্তব কবিরাজ– চেয়ারম্যান, জামালপুর (মেডিকেল রোড) শান্তি কমিটি
ডা. মো. আবদুস সামাদ খান– সাধারণ সম্পাদক শান্তি কমিটি জামালপুর
মোঃ ইয়াদ আলী খান– শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেরপুর মহকুমা
এডভোকেট হাবিবুর রহমান (মৃত)– শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, শেরপুর
ফজলুল হক– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, নেত্রকোনা মহকুমা
শেখ নজমুল হোসেন– শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক, নেত্রকোনা
লোকমান মৌলভী– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, কিশোরগঞ্জ
মওলানা আতাউর রহমান খান– সাধারণ সম্পাদক
আবদুল আওয়াল খান– সাধারণ সম্পাদক, শান্তি কমিটি, যশোদল, কিশোরগঞ্জ
মৌলভী হাকিম হাবিবুর রহমান– চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, টাঙ্গাইল জেলা
আবদুল খালেক– সেক্রেটারি, শান্তি কমিটি, টাঙ্গাইল জেলা
মজিদ সরকার– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, গাজীপুর মহকুমা
আফজাল হোসেন– আহ্বায়ক (পরে চেয়ারম্যান), শান্তি কমিটি, ফরিদপুর জেলা
হামিদ খোন্দকার– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মাদারীপুর
আবদুর রহমান হাওলাদার– শান্তি কমিটির সভাপতি, মাদারীপুর
মহিউদ্দীন– শান্তি কমিটির সহ-সভাপতি, মাদারীপুর
আবদুল হামিদ খন্দকার– শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক, মাদারীপুর

আয়েন উদ্দীন (কনভেনশন লীগ)– চেয়ারম্যান, রাজশাহী জেলা শান্তি কমিটি
আজিজুর রহমান আল-আমীন– সম্পাদক, রাজশাহী জেলা শান্তি কমিটি
লতিফ হোসেন– চেয়ারম্যান, নবানগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি
তৈয়ব আলী– সেক্রেটারি, নবানগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি
ক্যাপ্টেন এস এ এম জায়েদি– চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, পাবনা জেলা
মওলানা আবদুস সুবহান– ভাইস প্রেসিডেন্ট, শান্তি কমিটি, পাবনা জেলা
খন্দকার আবদুল জলিল– যুগ্ম-আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, পাবনা জেলা
মাওলানা আসাদুল্লাহ সিরাজী– চেয়ারম্যান, সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি
গোলাম আলম (কিউএমএল)– সেক্রেটারি সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি
তোফাজ্জল হোসেন মুখতার– আহ্বায়ক সিরাজগঞ্জ মহকুমা শান্তি কমিটি
আজিজুর রহমান খন্দকার– শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, গাইবান্ধা মহকুমা
সাইদুর রহমান (কাইয়ুম লীগ)– শান্তি কমিটির নেতা, গাইবান্ধা
মোঃ গোলাম রসুল– সাধারণ সম্পাদক, শান্তি কমিটি, ঠাকুরগাঁও মহকুমা
ডা. হাবিবুর রহমান খান– আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, বগুড়া জেলা
আবদুল আলীম– চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, জয়পুরহাট মহকুমা
মাওলানা এম আজিজ– আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, জয়পুরহাট মহকুমা
আকমল হোসেন– আহ্বায়ক, জয়পুরহাট সদর থানা শান্তি কমিটি
বি এ মজুমদার– চেয়ারম্যান, ঝিনাইদহ মহকুমা শান্তি কমিটি
হাবিবুর রহমান জোয়ার্দার– শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, ঝিনাইদহ
মজনু– শান্তি কমিটির সেক্রেটারি, ঝিনাইদহ
সা'দ আহমদ– চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটি
মশিউল আজম খান– আহ্বায়ক, মাগুরা মহকুমা শান্তি কমিটি
আসগর আলী মোল্লা– আহ্বায়ক, চুয়াডাঙ্গা, মহকুমা শান্তি কমিটি
সবদর আলী– আহ্বায়ক, মেহেরপুর মহকুমা শান্তি কমিটি
সৈয়দ বদরুল আলী– সেক্রেটারি, যশোর জেলা শান্তি কমিটি
আবুল হোসেন– সদস্য, খুলনা জেলা শান্তি কমিটি
আমজাদ হোসেন (সাবেক মন্ত্রী)– খুলনা জেলা শান্তি কমিটি
আইউব হোসেন– আহ্বায়ক, খুলনা শহর শান্তি কমিটি
এ গফুর– আহ্বায়ক, সাতক্ষীরা মহকুমা শান্তি কমিটি
ডা. মোজাম্মেল হক– আহ্বায়ক, বাগেরহাট মহকুমা শান্তি কমিটি
আবদুর রব– সভাপতি, শান্তি কমিটি, বরিশাল জেলা
আবদুর রহমান বিশ্বাস– নেতা, শান্তি কমিটি, বরিশাল জেলা
মওলানা বশিরুল্লাহ– নেতা, শান্তি কমিটি, বরিশাল জেলা

আবুল হোসেন– সভাপতি, শান্তি কমিটি, বরিশাল মহকুমা
এম এ খালেক– সম্পাদক, শান্তি কমিটি, বরিশাল মহকুমা
আলাউদ্দিন সিকদার– চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, পটুয়াখালী
খান বাহাদুর আফজাল খান– প্রেসিডেন্ট, শান্তি কমিটি, পিরোজপুর
এ জাফর মোল্লা– সহ-সভাপতি, শান্তি কমিটি, পিরোজপুর
এ সাত্তার মিয়া– সেক্রেটারি, পিরোজপুর শান্তি কমিটি
আবদুল মোতালেব– সাধারণ সম্পাদক, শান্তি কমিটি, বরগুনা
শাহেদ আলী– আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, সিলেট জেলা
আনোয়ার রাজা– চেয়ারম্যান, মহকুমা শান্তি কমিটি, সুনামগঞ্জ
বিএবিটি আবদুল বারী– আহ্বায়ক, মহকুমা শান্তি কমিটি, মৌলভীবাজার
মিসিরউল্লা– আহ্বায়ক, মহকুমা শান্তি কমিটি, মৌলভীবাজার
মৃত সৈয়দ কামরুল ইসলাম– আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, হবিগঞ্জ
অ্যাডভোকেট সায়েদুল হক– চেয়ারম্যান, জেলা শান্তি কমিটি, নোয়াখালী
মুনীর– সেক্রেটারি, জেলা শান্তি কমিটি, নোয়াখালী
খায়েজ আহমেদ– চেয়ারম্যান, ফেনী মহকুমা শান্তি কমিটি
নূরুল ইসলাম খান– চেয়ারম্যান, কুমিল্লা উত্তর মহকুমা শান্তি কমিটি
আলহাজ এম এ সালাম– আহ্বায়ক, চাঁদপুর মহকুমা শান্তি কমিটি
মোঘল মিয়া– চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা
আলহাজ আবদুস সামাদ– অহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা
মাহমুদুন্নবী চৌধুরী (পিডিপি)– আহ্বায়ক, শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম জেলা
হাফেজ মকবুল আহমেদ– প্রধান সমন্বয়কারী, শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম জেলা
অধ্যাপক ওসমান বনজ (জামায়াত)– সংগঠক, শান্তি কমিটি, চট্টগ্রাম জেলা

রাজাকার হাইকমান্ড (প্রথম পর্যায়)

নাম	পদবী	কর্মস্থল
এ এস এম জহুরুল হক	পরিচালক	সদর দফতর
এম ই মৃধা	সহ-পরিচালক	সদর দফতর
মফিজ ভুঁইয়া	সহ-পরিচালক	পশ্চিম রেঞ্জ
এম এ হাসনাত	সহ-পরিচালক	কেন্দ্রীয় রেঞ্জ
ফরিদ উদ্দিন	অ্যাডজুটেন্ট	সদর দফতর
মোস্তাক হোসেন চৌধুরী	কমান্ডার	চট্টগ্রাম জেলা
শামসুল হক	কমান্ডার	সিলেট জেলা
এ এস এম জহিরুল হক	কমান্ডার	ঢাকা জেলা

এম মুজিবর রহমান	কমান্ডার	বরিশাল জেলা
সিরাজুদ্দিন আহমেদ খান	কমান্ডার	খুলনা জেলা
আবদুল হাই	কমান্ডার	যশোর জেলা
আরিফ আলী সরদার	কমান্ডার	পটুয়াখালী জেলা
আসাদুজ্জামান তালুকদার	কমান্ডার	কুষ্টিয়া জেলা
এ কে এম আবদুল আজিজ	কমান্ডার	পাবনা জেলা
এম হাবিবুর রহমান	কমান্ডার	রাজশাহী জেলা
শামসুজ্জামান	কমান্ডার	বগুড়া জেলা
আবদুল ওয়াদুদ	কমান্ডার	দিনাজপুর জেলা
আফতাব উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	রংপুর জেলা
মোসলেম উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	মেহেরপুর মহকুমা
ফজলুল কবির	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
সাইফউদ্দিন চৌধুরী	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
এ টি এম ফজলুল করিম	কমান্ডার	কুষ্টিয়া সদর মহকুমা
ওয়াসিউদ্দিন তরফদার	কমান্ডার	চুয়াডাঙ্গা মহকুমা
সাইফউদ্দিন চৌধুরী	কমান্ডার	বরগুনা মহকুমা
মকবুল আলী খান	কমান্ডার	বরিশাল সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	বরিশাল সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
খান জহিরুল হক	কমান্ডার	যশোর সদর মহকুমা
আবদুস সোবহান	কমান্ডার	যশোর সদর মহকুমা
তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	কুড়িগ্রাম মহকুমা
নূর আহমদ	কমান্ডার	গাইবান্ধা মহকুমা
আফজাল উদ্দিন সিকদার	কমান্ডার	জয়পুরহাট মহকুমা
সোহরাব আলী মণ্ডল	কমান্ডার	বগুড়া সদর মহকুমা
মাহমুদ জং	কমান্ডার	নবাবগঞ্জ মহকুমা
আবদুল কাদির	কমান্ডার	নওগাঁ মহকুমা
খাজা ফকির মোহাম্মদ	কমান্ডার	সিরজগঞ্জ মহকুমা
তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	নড়াইল মহকুমা
আশরাফ উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	নড়াইল মহকুমা
মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	বাগেরহাট মহকুমা
মারুফ হোসেন	কমান্ডার	খুলনা সদর মহকুমা

জয়নুদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	সাতক্ষীরা মহকুমা
তৈয়বুর রহমান	কমান্ডার	বরিশাল সদর মহকুমা
আবদুল সোবহান	কমান্ডার	ভোলা মহকুমা
দেওয়ান আক্তার উদ্দিন আহমেদ	কমান্ডার	ঝালকাঠি মহকুমা
আবদুল মালেক খান	কমান্ডার	টাঙ্গাইল সদর মহকুমা
শমসের আলী	কমান্ডার	টাঙ্গাইল সদর মহকুমা
আনোয়ার উদ্দিন	কমান্ডার	জামালপুর মহকুমা
শমসের আলী	কমান্ডার	ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
সৈয়দ মো. শাহজাহান	কমান্ডার	ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
এ মালেক খান	কমান্ডার	ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) মহকুমা
খসরুজ্জামান	কমান্ডার	কিশোরগঞ্জ মহকুমা
মতিউর রহমান খান	কমান্ডার	মানিকগঞ্জ মহকুমা
আবদুল কাইয়ুম খান	কমান্ডার	মানিকগঞ্জ মহকুমা
খলিলুর রহমান	কমান্ডার	মুন্সীগঞ্জ মহকুমা
এন এ হাসনাত	কমান্ডার	ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা
চান্দ মিয়া	কমান্ডার	ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমা
কাজী জহিরুল হক	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
মুস্তাফিকুজ্জামান	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
ফরিদ উদ্দিন	কমান্ডার	ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
মোহাম্মদ উল্লাহ	কমান্ডার	নারায়ণগঞ্জ মহকুমা
আবুল কাসেম খান	কমান্ডার	গোয়ালন্দ মহকুমা
আবুল কাসেম খান	কমান্ডার	ফরিদপুর সদর মহকুমা
আবদুল লতিফ মিয়া	কমান্ডার	ফরিদপুর সদর মহকুমা
মনসুর আলী	কমান্ডার	গোপালগঞ্জ মহকুমা
রুহুল আমিন খান	কমান্ডার	মাদারীপুর মহকুমা
এবিএম আশরাফ উদ্দিন	কমান্ডার	সিলেট সদর মহকুমা
এ টি এম মহিউদ্দিন	কমান্ডার	হবিগঞ্জ মহকুমা
সাইদুর রহমান	কমান্ডার	ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা
এস ইসমাইল চৌধুরী	কমান্ডার	কুমিল্লা সদর (উত্তর) মহকুমা
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান	কমান্ডার	কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা
সাইদ আলী	কমান্ডার	চাঁদপুর মহকুমা

আবদুল হালিম চৌধুরী	কমান্ডার	ফেনী মহকুমা
সিরাজুল হক	কমান্ডার	নোয়াখালী সদর মহকুমা
সিরাজুল হক	কমান্ডার	চট্টগ্রাম সদর (উত্তর) মহকুমা
এ এস এরশাদ হোসেন	কমান্ডার	চট্টগ্রাম সদর (দক্ষিণ) মহকুমা

সূত্র : ঢাকা গেজেট, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এবং এ এস এম সামছুল আরেফিনের 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান'

পরে ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতা মুহম্মদ ইউনুসকে কমান্ডার-ইন-চিফ, মীর কাসেম আলীকে চট্টগ্রামের প্রধান এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানদের নিজ নিজ জেলার রাজাকার বাহিনীর প্রধান করা হয়।

একাত্তরের ৩১ অক্টোবর *দৈনিক সংগ্রাম* এবং ৭ সেপ্টেম্বর *পাকিস্তান অবজারভার*-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী

১. আব্বাস উদ্দিন– বরিশাল জেলা রাজাকার কমান্ডার
২. এ কে এম হারুনর রশীদ খান– পিরোজপুর মহকুমা কমান্ডার
৩. রাজাকার আদম মিয়া– সিলেট ৪. রাজাকার ওসমান গনি– সিলেট
৫. রাজাকার আবদুর রহমান– সিলেট ৬. রাজাকার আবদুল হাশিম– সিলেট

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় যেসব রাজাকারের নাম আসে–

৭. আবু হানিফ আফ্রাদ–ঢাকা (দৈনিক বাংলা, ৯-২-৭২) ৮. মো. আলম–ঢাকা (পূর্বদেশ, ২-১-৭২) ৯. আবু মুয়িদ চৌধুরী, ১০. নাজিম আহমদ, ১১. তাহের (হাজারীবাগ) ও ১২. মোহা. সেলিম (হাজারীবাগ)–ঢাকা (পূর্বদেশ, ১৫-১-৭২) ১৩. ফিরোজ মিয়া–কমান্ডার, ফকিরাপুল, ঢাকা (বাংলাদেশ অবজারভার, ১৬-৭-৭২) ১৪. আনোয়ারুল হক– তেজগাঁও, ঢাকা, ১৫. সিরাজুল হক–ঢাকা, ১৬. মঞ্জুর আহমদ–ঢাকা, ১৭. আমিনুল হক–ঢাকা (পূর্বদেশ, ২-১-৭২ ও ৩-১-৭২) ১৮. লাল মিয়া–ঢাকা, ১৯. জমিরুদ্দিন–ঢাকা (পূর্বদেশ, ৪-১-৭২) ২০. কুদরত আলী–ঢাকা, ২১. সিদ্দিক তালুকদার–ঢাকা (পূর্বদেশ, ৫-১-৭২) ২২. সানউল্লা–ঢাকা, ২৩. আতিক–মিরপুর, ঢাকা (পূর্বদেশ ৭-১-৭২, ৮-১-৭২) ২৪. মুসা, ২৫. তোতা মিয়া–ঢাকা, ২৬. হেদায়েতউল্লাহ, ২৭. ঈমান আলী–রায়েরবাজার ২৮. আকবর–শাঁখারী বাজার; ২৯. ইব্রাহিম ও ৩০. ভূলা মিয়া–ময়মনসিংহ ৩১. আতাউর রহমান খান ও ৩২. প্রফেসর মাহতাবউদ্দিন–কিশোরগঞ্জ ৩৩. কাজী ইমদাদুল হক, ৩৪. আবুল কালাম আজাদ–ফরিদপুর (পূর্বদেশ, ৮-১-৭২) ৩৫. মহিউদ্দিন, ৩৬. শফিকুল ইসলাম–কমান্ডার, ফরিদপুর (পূর্বদেশ, ৫-১-৭২) ৩৭. এরাত হোসেন ও ৩৮. বিল্লাল বিশ্বাস–কমান্ডার, যশোর (পূর্বদেশ, ৫-১ ও ১৫-১-৭২) ৩৯. আবদুস সালাম–কমান্ডার, বাবুগঞ্জ, বরিশাল (পূর্বদেশ, ৮-১-৭২) ৪০. আ. লতিফ–মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা (পূর্বদেশ, ৮-১-৭২)

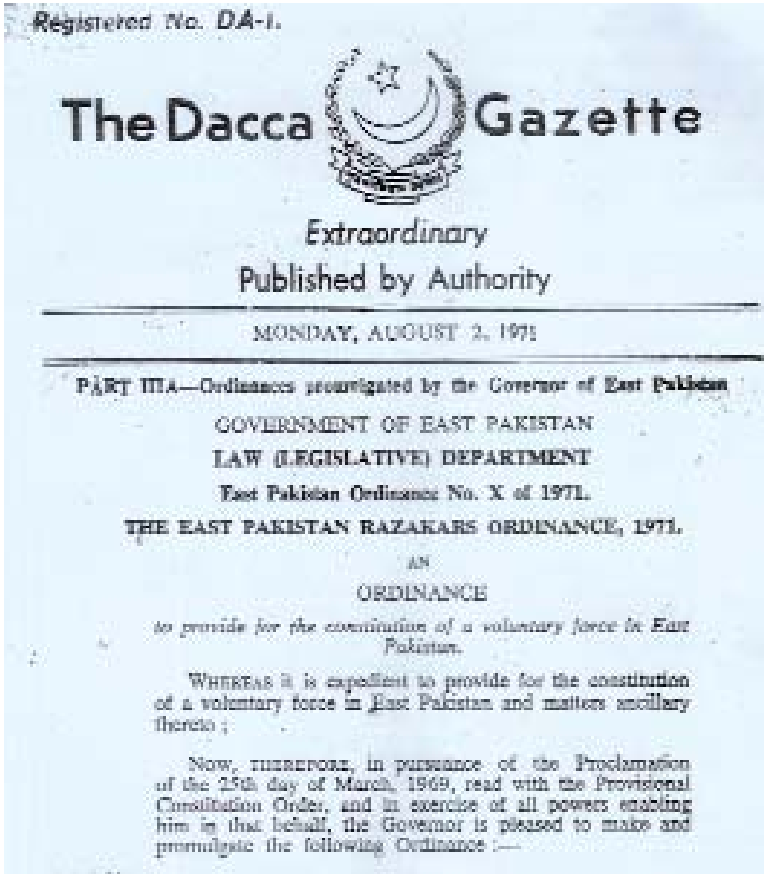

Registered No. DA-1.

The Dacca Gazette

Extraordinary

Published by Authority

MONDAY, AUGUST 2, 1971

PART IIA—Ordinances promulgated by the Governor of East Pakistan

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

LAW (LEGISLATIVE) DEPARTMENT

East Pakistan Ordinance No. X of 1971.

THE EAST PAKISTAN RAZAKARS ORDINANCE, 1971.

AN

ORDINANCE

to provide for the constitution of a voluntary force in East Pakistan.

WHEREAS it is expedient to provide for the constitution of a voluntary force in East Pakistan and matters ancillary thereto ;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 25th day of March, 1969, read with the Provisional Constitution Order, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Governor is pleased to make and promulgate the following Ordinance :—

রাজাকার অধ্যাদেশের গেজেট

আল-বদর হাইকমান্ড (ইসলামী ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি)

১. মতিউর রহমান নিজামী (প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান প্রধান, পরে সারা পাকিস্তান প্রধান)
২. আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান প্রধান)
৩. মোহাম্মদ ইউনুস (ছাত্রসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, রাজাকারপ্রধান)
৪. মীর কাসেম আলী (প্রথমে চট্টগ্রাম জেলা প্রধান, পরে হাইকমান্ডের তৃতীয় স্থানে)
৫. মুহম্মদ কামারুজ্জামান (শুরুতে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বদরবাহিনীর প্রধান সংগঠক)
৬. মুহাম্মদ আশরাফ হোসাইন (বদরবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও ময়মনসিংহ জেলা প্রধান)

৭. মোহাম্মদ শামসুল হক
৮. মোস্তফা শওকত ইমরান
৯. আশরাফুজ্জামান খান (বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ)
১০. চৌধুরী মঈনুদ্দীন (বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অপারেশন ইনচার্জ)
১১. আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস
১২. সরদার আবদুস সালাম
১৩. খুররম ঝা মুরাদ
১৪. আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী প্রধান)
১৫. আবদুল জাহের মোহাম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম প্রধান)
১৬. আবদুল বারী (জামালপুর প্রধান)
১৭. মতিউর রহমান খান (খুলনা প্রধান)

এ ছাড়া একাত্তর ও বায়াত্তরে বিভিন্ন পত্রিকায় আলবদরের জেলা ও মহকুমা কমান্ডার হিসেবে যাদের নাম প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে আছে–

১৮. সিদ্দিক জামাল–খুলনা জেলা কমান্ডার, ১৯. এ কে এম ফারুকী ও
২০. আনসার উদ্দীন–খুলনা মহকুমা কমান্ডার, (দৈনিক সংগ্রাম ৫ নভেম্বর ১৯৭১)
২১. মাহমুদ হোসাইন আল মামুন–বরিশাল জেলা প্রধান (আজাদ ১২-১১-১৯৭১)
২২. লুৎফর রহমান–গাইবান্ধা মহকুমা কমান্ডার (একাত্তরের নভেম্বরে প্রকাশিত)
২৩. মনছুরউদ্দৌল্লা পাহলোয়ান–শেরপুর মহকুমা কমান্ডার (আজাদ, নভেম্বর ১৯৭১)
২৪. ইসাক মিয়া–মিরপুর ও ২৫. আব্দুল্লাহ–সূত্রাপুর (পূর্বদেশ ৭-১-৭২)
২৬. সেরাজুল হক–ঢাকা (পূর্বদেশ ৭-১-৭২)
২৭.খলিলুল্লা–ঢাকা (পূর্বদেশ ৮-১-৭২)
২৮. মমতাজ আলী–মিরপুর (পূর্বদেশ ১০-১-৭২)
২৯. সিরাজুল ইসলাম–মনোহরদী (পূর্বদেশ ১৫-১-৭২)
৩০. এ এ তারেক–কমান্ডার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা (পূর্বদেশ ১৫-১-৭২)
৩১. কেএম আমিনুল হক–কিশোরগঞ্জ কমান্ডার

Absconding
Al-Badr
gang ster
By A Staff Correspondent
Chowdhury Mainud-

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অপারেশন ইনচার্জ পলাতক চৌধুরী মঈনুদ্দীনের ছবি সংবলিত খবর –বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯-১২-৭১

ঢাকায় ২৫ মার্চ কালরাতে পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নমুনা (ওপরে নগরীর চকবাজার এলাকা এবং নিচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন)

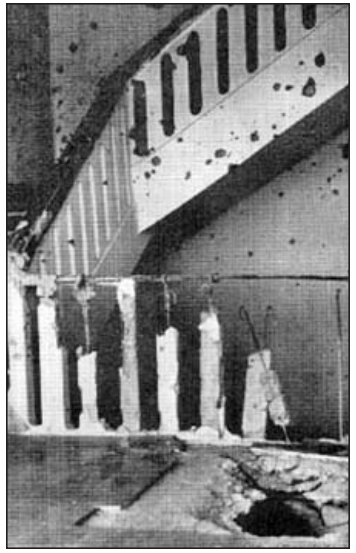

শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকান্ড
সংঘটিত করেছে 'আল-বদর'
বর্বর বাহিনী

বহু লাশ উদ্ধার

কোন ভাষায়
প্রকাশ করব
'আল-বদর'
শব্দদের এই
নৃশংসতা।

রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের লাশ
রশীদ তালুকদারের তোলা ছবি

গণহত্যার নমুনা